চৌধুরী পরিবারের শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা - ২০২৩
পায়ে পায়ে পঁচিশ
শ্রী শ্রী দুর্গা মহাপূজা - ২০২৩
চৌধুরী পরিবার
২৫তম বর্ষ
স্মারক পত্রিকা

“

আমাদের সব পরিবারেই একজন কর্তা থাকেন; দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবার-পরিচালনার কাজে সফল হন, কয়েকজন হন না। কেন এটা হয়? আমাদের বিফলতার জন্য আমরা দোষ চাপাই পরিবারের অন্যান্য লোকের ওপর। যে মুহূর্তে আমি ব্যর্থ হই, অমনি ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করি। বাস্তবিক, কোনো কাজে ব্যর্থ হলে নিজের দোষত্রুটি এবং দুর্বলতাগুলোকে কেউ স্বীকার করতে চায় না। নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে সকলেই, আর ব্যর্থতার দায় চাপায় কোনো ব্যক্তি বা অপর কিছুর ঘাড়ে, নয়তো দুর্ভাগ্যের ঘাড়ে। গৃহকর্তারা যখন অকৃতকার্য হন, তখন তাঁদের নিজেদের মনেই প্রশ্ন তোলা উচিত যে - কেউ কেউ তো বেশ ভালভাবেই সংসার চালায়, আবার কেউ কেউ তা পারে না কেন? দেখা যাবে যে, সব নির্ভর করছে গৃহকর্তার ওপর - এই পার্থক্য সৃষ্টির কারণ লোকটি নিজে - তাঁর উপস্থিতি, তাঁর ব্যক্তিত্ব। মানবজাতির আদর্শ নেতাদের কথা ভাবতে গেলে আমরা সর্বদা দেখব, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁরা সফল হতে পেরেছিলেন।

”

- স্বামী বিবেকানন্দ

Complete Works of Swami Vivekananda,
vol. 2, p. 14, Advaita Ashrama

পায়ে পায়ে পঁচিশ
চৌধুরী বাড়ির শ্রী শ্রী দুর্গা মহাপূজা - ২০২৩
২৫ তম বর্ষ
স্মারক পত্রিকা
শ্রী শ্রী দুর্গা মহাপূজা - ২০২৩
চৌধুরী পরিবার
২৫তম বর্ষ
চৌধুরী পরিবার
কোন্নগর, হুগলী, পঃ বঃ

‘পায়ে পায়ে পঁচিশ’

চৌধুরী পরিবারের শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা (২৫ তম বর্ষ) - স্মারক পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রী দীপ চৌধুরী

চৌধুরী পরিবার
১২৫, হারান চন্দ্র ব্যানার্জী লেন
কোন্নগর, হুগলী, পঃ বঃ
website: https://sites.google.com/view/chowdhury
e-mail id: home.chowdhurys@gmail.com

ISBN 978-93-6076-438-8

২৬শে নভেম্বর, ২০২৩

প্রচ্ছদ চিত্রগ্রহণে- কুমারী সৃজা চৌধুরী

শিল্পী - উপায়ন পাল

Revered President Maharaj's Quarters'
Ramakrishna Math,
P.O. Belur Math, Dist. Howrah 711 202, West Bengal., India
Phones PBX: (033) 2654-1144/1180/5391/9581/9681/8494/5700(4 lines)
Fax: (033) 2654-4346
E-mail: president@rkmm.org
Website: www.belurmath.org

কল্যাণীয় দীপ,

আসন্ন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে পাঠানো তোমার পত্র পেলাম।
শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের শুভাশীর্বাদে এই দুর্গাপূজা সুসম্পন্ন হউক ও তোমরা সকলে ভাল থাক — এই প্রার্থনা জানাই।
আশাকরি তোমরা সকলে ভাল আছ।
তোমরা সকলে আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানবে।

ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী স্মরণানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

হাওড়া রামরাজাতলার চৌধুরী পাড়ার আদি নিবাসী চৌধুরী পরিবারের এক স্রোতের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা
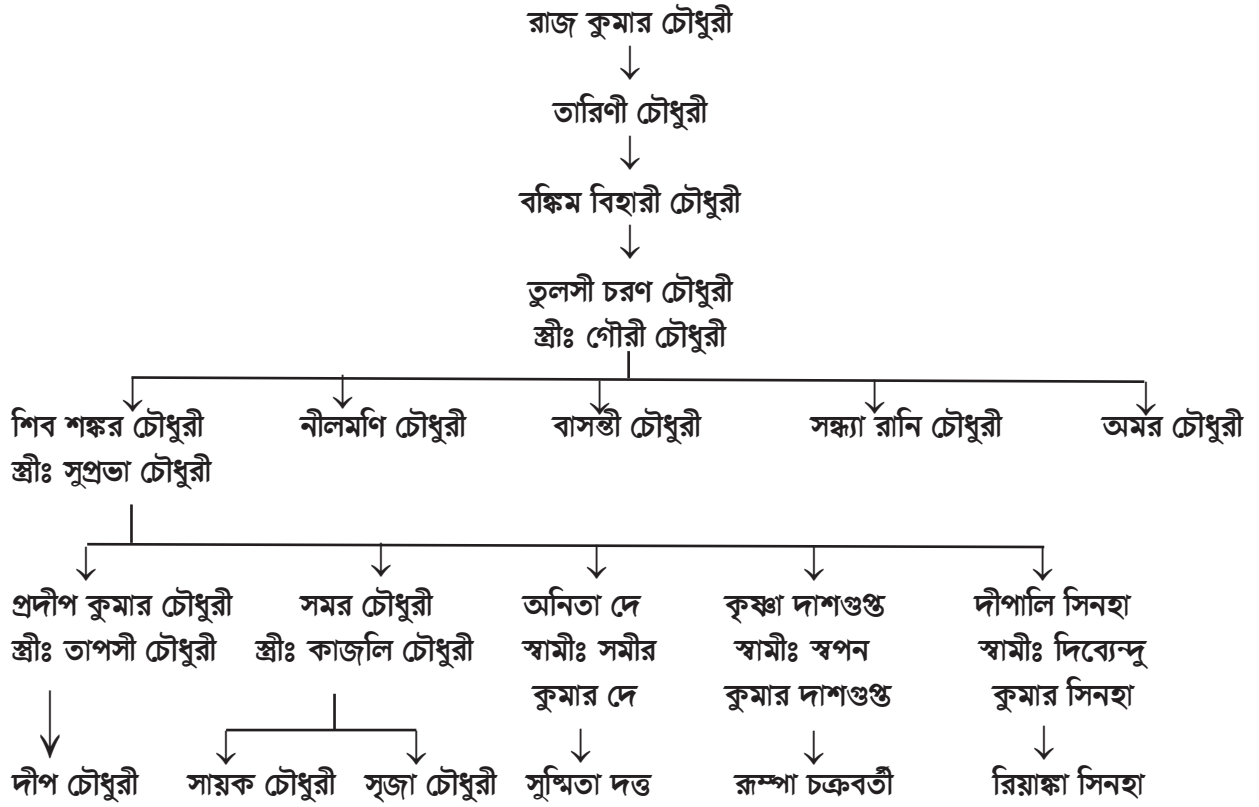
নবপত্রিকা স্নান করিয়ে এনেছেন প্রদীপ কুমার চৌধুরী, সমর চৌধুরী, ছোট্ট সায়ক ও দীপ। সঙ্গে দাঁড়িয়ে কর্তা শিবশঙ্কর ও তাঁর ভ্রাতা নীলু চৌধুরী

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

সম্পাদকের বার্তা

শ্রী দীপ চৌধুরী

১২৫ হারান চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কোন্নগর, হুগলী, পিন - ৭১২২৩৫
চলভাষ নং: ৬২৯০৯১৫০৫১
ইমেলঃ dchow.chem@gmail.com

পরমকারুনিক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে প্রকাশিত হল চৌধুরী বাড়ির ২৫ তম শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্মারক পত্রিকা 'পায়ে পায়ে পঁচিশ'। এই পত্রিকার মাধ্যমে যেমন আমাদের বাড়ির শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ইতিহাস ও নিয়ম-কানুনকে লিপিবদ্ধ করা হল তেমনই পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-প্রিয়জনের শিল্পবোধের ও কৃষ্টির একটা নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। যাঁরা পত্রিকায় রচনা দিয়েছেন তাঁদের পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা ছবি এঁকেছেন, ছবি তুলেছেন তাঁদেরও জানাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা। পরিবারের সকলকে জানাই প্রণাম কারণ তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হতো না। এই পত্রিকাটির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১। পূজা সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি পূজার অনুষ্ঠানসূচী, নিয়ম ও ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। এই নিয়মগুলিই আচরিত হয়।

২। পূজার তথ্যভিত্তিক রচনাগুলির তথ্য নির্ভুল ও যাচাই করেই দেওয়া, সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

৩। সমস্ত সৃষ্টিই (কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া বা চিত্র) সৃষ্টিকর্তার মৌলিক চিন্তার অভিব্যক্তি, এখানে সম্পাদকের কোনরূপ দায়বদ্ধতা নেই।

৪। প্রতিটি রচনাতেই শিল্পী, রচয়িতার নাম দেওয়া আছে। পত্রিকার পরিশিষ্টে রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র সন্নিবেশিত রয়েছে। পাঠক রচয়িতা বা শিল্পীর নামের উপর ক্লিক/ট্যাপ করলে সরাসরি পরিচিতিতে চলে যেতে পারেন।

৫। ই-বুকটি যেকোন আপডেটেড রিডার সফটওয়্যারে পড়া যাবে। পিডিএফ ফাইলটি সহজেই প্রিন্ট করা যাবে।

প্রতিটি পাঠকের কাছে অনুরোধ সমগ্র পত্রিকাটি পাঠ করুন এবং আপনার মতামত, অভিযোগ জানান ইমেইলের মাধ্যমে অথবা নিচের কিউ আর -টি স্ক্যান করে ফর্মের মাধ্যমে।

রাস পূর্ণিমা, ১৪৩০
কোন্নগর, হুগলী

ধন্যবাদন্তে -
দীপ চৌধুরী

১২৫, হারান চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কোন্নগর, হুগলী, পঃ বঃ,
পিন- ৭১২২৩৫
sites.google.com/view/chowdhurys

দুই - চার কথা অতীতের

শ্রী শ্রী ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের বাড়িতে গত ২১, ২২ এবং ২৩শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে (৩, ৪ এবং ৫ই কার্ত্তিক – সাধারণ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) শ্রী শ্রী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর পঞ্চবিংশতম বার্ষিক মহাপূজা অনুষ্ঠান করা হল।

২৫টা বছর তো আর কম কথা নয় - ভগবানের আশীর্বাদকে পাথেয় করেই সম্ভব হয়েছে এত দিনের পথ চলা। কত হাসি কত কান্না কত অশ্রু কত আনন্দে মাখা এতগুলি বছর ধরে কোন্নগরের বাড়িতে চলে আসছে এই পূজা। আমরা ২০০৯ সালে হারিয়েছি সকলের অভিভাবক শিব শঙ্কর চৌধুরী ও তাঁর ভ্রাতা নীলমণি চৌধুরীকে। ২০১৮ সালে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন বাড়ির ছোট কর্তা সমর চৌধুরীও। বিধাতার কি নিষ্ঠুর ইচ্ছা! করোনা মহামারিতে যখন 'শ্মশানের সাম্যবাদ' চতুর্দিকে, আমাদের থেকে করোনা কেড়ে নিল বাড়ির মেজো জামাই স্বপন কুমার দাসগুপ্তকেও। এঁরা অনেক অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন, শ্রমদান করেছিলেন এই ২৫ বছরের পূজাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজ আমরা যে আয়োজন করেছিলাম হয়তো তাঁরা সূক্ষ্ম শরীরে তা দেখে আনন্দ পাচ্ছেন এবং দূর থেকে আশীর্বাদ করছেন।

সব বছরের মতো এই বছরেও আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আয়োজন করা হল দেবীর পূজা। যাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া এই পূজা সফল ভাবে করা যেত না তাঁরা হলেন (সর্বশ্রী) শুভদীপ চক্রবর্তী, কুনাল চক্রবর্ত্তী, মলিন চট্টোপাধ্যায়, রাহুল দে, রঞ্জন মৌলে, শুভজিৎ দে, দীপ দে, বিশ্বজিৎ পাল, নূপুর দাস, শিব কুমার সিং, টুলু দাস প্রমুখ মহাশয় এবং (সর্ব শ্রীমতি) মিতালি চক্রবর্তী, নীলিমা সাউ, সুমিত্রা মণ্ডল, বৈশাখী মাল প্রমুখ মহাশয়া। তাঁদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও প্রণাম।

তবে রজত জয়ন্তীবর্ষ পূর্তিতে বিশেষ আয়োজন হল - বিজয়া সম্মেলন এবং স্মারক পত্রিকা প্রকাশ। যারা এই বিরাট কর্মযজ্ঞে আমাদের পাশে এসেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে অনেক ধন্যবাদ। বিজয়া সম্মেলনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করলেন তাঁদের সকলকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। যাঁরা পত্রিকায় তাঁদের রচনা নিবেদন করবেন সেই সকল গুণীজনকে আমাদের নমস্কার।

সকলে আনন্দে থাকুন, ভালো থাকুন। আমাদের এই পূজা যেন যুগ যুগ ধরে তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে এই প্রার্থনা করি শ্রী শ্রী দেবীর কাছে।

ইতি -
চৌধুরী পরিবারের সকল সদস্য

প্রদীপ কুমার চৌধুরী
তাপসী চৌধুরী
কাজলি চৌধুরী
সায়ক চৌধুরী
দীপ চৌধুরী
সৃজা চৌধুরী

সূচিপত্র

শিবসংকল্প সূক্তম্

ঋগ্বেদ, ৩৪/১/৬

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।। ১।।
যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃন্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।
যদ্ পূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।। ২।।
যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু।
যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।। ৩।।
যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্।
যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।। ৪।।
যস্মিন্নৃচঃ সাম যজূংগংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিংগংশ্চিত্তগং সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।। ৫।।
সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুঽভির্বাজিন ইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।। ৬।।

যে দৈব মন, জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা দূরগামী, সুষুপ্তিকালে সর্ব বিষয় থেকে নিবর্তিত হয়ে হৃদয়ে লয় হয়, যা দূরগামী ও শব্দাদি বিষয়ের প্রকাশক জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহেরও যিনি একমাত্র প্রকাশক সেই আমার মন শুভ, শান্ত ও সংকল্পযুক্ত হোক।। ১।।

মনীষাসম্পন্ন কর্মকাণ্ডিগণ যে মন দ্বারা যজ্ঞাদি কর্মসকল অনুষ্ঠান করে থাকেন, যা ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্বে সৃষ্ট, যজ্ঞপটু, প্রাণীদিগের অন্তরস্থ সেই আমার মন শুভ, শান্ত ও সংকল্পযুক্ত হোক।। ২।।

যে-মন বিশেষ জ্ঞানের জনক, চেতয়িতা, ধৈর্যযুক্ত সকল প্রাণীর অন্তরে থেকে সর্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক জ্যোতি অমৃত, যে-মন ব্যতীত কেউ কোন কর্ম করতে পারে না, সেই আমার মন শুভ, শান্ত ও সংকল্পযুক্ত হোক।। ৩।।

যে শাশ্বত (মুক্তি পর্যন্ত স্থায়ী) মনের দ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকালীন দ্রব্যসমূহ পরিগৃহীত হয়, যার দ্বারা (মৈত্রাবরুণাদি) সপ্তহোতা নিষ্পন্ন অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিস্তৃত হয় সেই আমার মন শুভ, শান্ত ও সংকল্পযুক্ত হোক।। ৪।।

রথ নাভিতে অরাসমূহ যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই রূপ ঋক্-সাম-যজুঃ যাতে প্রতিষ্ঠিত, যে-মনে প্রজাসকলের জ্ঞান পটের সুতোর ন্যায় ওতপ্রোত রয়েছে সেই আমার মন শুভ, শান্ত ও সংকল্পযুক্ত হোক।। ৫।।

কৌশলী সারথি যেরূপ কশা দ্বারা অশ্বকে পরিচালিত করেন তদ্রূপ যিনি প্রাণিসমূহকে ইতস্তত নিয়ে যান, কৌশলী সারথি যেরূপ প্রগ্রহ (বল্গা, লাগাম) দ্বারা অশ্বকে সংযত করেন সেইরূপ যে-মন জীবকে নিয়মন করেন, যেই মন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, জরারহিত, বেগবান সেই আমার মন শুভ, শান্ত ও সংকল্পযুক্ত হোক।। ৬।।

দুর্গা পূজার কথা - শূন্য থেকে পঁচিশ

প্রদীপ কুমার চৌধুরী

চৌধুরী বাড়ির পূজা পায়ে পায়ে পঁচিশে। কেমন করে শুরু এই পূজা, কিভাবে কেটেছে এই পঁচিশ বছর? এই রকম প্রশ্ন সত্যিই আকর্ষণীয়। এই সমস্ত প্রশ্ন ঘিরে রয়েছে পরিবারের ইতিহাসকে, তৎকালীন মানুষের আদর্শ-মতবাদ-ইচ্ছা শক্তিকে। পরিবারের কর্তা, এবং সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সদস্য শ্রী প্রদীপ কুমার চৌধুরীর সাথে কথোপকথন করে জেনে নেওয়া হল অনেক, অনেক তথ্য।

প্রশ্নঃ দুর্গাপূজা তো এক বিশাল আয়োজন। হটাৎ এই পূজা বাড়িতে করা হবে এমন ইচ্ছা কেন হল?

উত্তরঃ ছোট বেলার কথা বলি। স্কুল – রাজেন্দ্র স্মৃতিতে পড়ি। মণ্ডপে প্রতিমা তৈরি হতো। রাজেন্দ্রনগর কো-ওপারেটিভের পূজা হতো তখন। সালটা তাও ১৯৬৫ - ১৯৭০ হবে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম – 'কবে পুজো আসবে?'। এই ভাবতে ভাবতেই মনে হতো, "বড় হয়ে আমি কি কোন দিন আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা করতে পারব?" আমরা ছোট, পাঁচ ভাই-বোন। বাবার আর্থিক ক্ষমতা সেরকম নেই, সংকট লেগেই আছে। কোনদিন কি সম্ভব পূজা করা? সাধ জেগেছিল যে বড়। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতাম। মণ্ডপে আমার মা, (শ্রীমতি সুপ্রভা চৌধুরী) ঠাকুমারা (শ্রীমতি গৌরী চৌধুরী, মৃত্যু ১৯৬৩) রীতি অনুসরণ করে সন্ধিপূজায় পাঁচ ছটাক মাঠাচিনির নৈবেদ্য এবং সন্দেশ নিবেদন করতেন এবং, দশমীর দিন থালা সাট করে বাড়ির চৌকাঠে ঝাড়া বাঁধতেন। বিকেল হলে বরণ করতে যেতেন। বিসর্জনের পর খুব দুঃখ হত। ঘাটে বিসর্জন দেখেছি আর ওই পুরাতন প্রার্থনা – "কবে আসবে, মা, আমাদের বাড়িতে?" কিন্তু – বাড়ির কাউকে বলা হয়ে উঠে নি। কেননা, একে অভাবের সংসার, লোকবল, অর্থবলের দরকার। কিন্তু সাধ ছিল মনে মনে। সাধের সাথে শুরু হল সাধনা - আসতে আসতে এল পরিবর্তন – আমার ব্যবসা সফল হল। ভাইও আমার সাথে ব্যবসায় নামল। তবুও, মনের বাসনা মনেই রইল – কিন্তু বলা হয় নি।

বড় হতে হতে চলে এলাম ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে, হটাৎ একদিন রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ আমি ছাদে গেছিলাম – কাজের কথা হচ্ছিল মনুর সাথে (ভ্রাতা শ্রী সমর চৌধুরী)। কথায় কথায় মনু বলল "দাদা, দুর্গাপূজা করব আমরা?" আমি এই কথা শুনে এত আনন্দ পেলাম যে দেবী যেন মনুর মুখ থেকে বলালেন আমার এতদিনের না বলা এই কথা। – এক কোথায় রাজি হলাম! "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় করব!" সেই সময় বাবা (শ্রী শিবশঙ্কর চৌধুরী) বাড়িতে ছিলেন, কাকা (শ্রী নীলমণি চৌধুরী) লক্ষ্ণৌতে ছিলেন ছোট বোনের বাড়িতে – বাবাকে নিচে এসে বলা হল। বাড়ির গিন্নীরাও সকলে মতামত দিলে বাবা ও কাকা সানন্দে অনুমতি দিলেন। বোনেরাও পেল আনন্দ। তারপর ১৯৯৯ সালের প্রথম পূজারম্ভ।

প্রশ্নঃ আচ্ছা। মানে, ছোটবেলার ভাবনা বড় বয়সে একটা রূপ পেল। কিন্তু, আপনাদের যে এই সিদ্ধান্ত অনেকটা পরে নেওয়া। জুলাই মাস! মানে তো

শ্রীশ্রীদেবীর পূজার আগে তন্ত্রধারকের বরণ করছেন শ্রী প্রদীপ কুমার চৌধুরী

বিশেষ কিছুই দেরি নেই। মোটে দুই তিন মাস! কি করে ব্যবস্থা করলেন? কে পূজা করবেন?

উত্তরঃ ঠিক, করবেন কে? কুলপুরোহিত রবীনদার (শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ গৌতম) এবং শ্যামুদার (শ্রী পরেশ চন্দ্র গৌতম) কাছে প্রস্তাব দেওয়া হল। তাঁরা প্রথমে কতকটা সাবধান করে দিলেন – দুর্গাপূজা মহাপূজা – এর কাজও অত্যন্ত ব্যাপক। আমাদের দৃঢ়তায় তাঁরা ব্যবস্থা করলেন শেষে। কিন্তু, তাঁরা তো ব্যস্ত কলকাতায় আমাদের জ্ঞাতি শ্রী নবলাল দে (বউবাজার) ও শ্রী সরোজ কুমার দের (বাগুইআটির) দুর্গাবাড়িতে পূজা করতে। তিনি তখন তাঁর মাসতুতো ভাই বৈদ্যবাটির মালিপাড়ার শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দিলেন।

প্রশ্নঃ তাহলে উনিই করলেন পূজা?

উত্তরঃ হ্যাঁ। আশুদা (শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য) নিলেন দায়িত্ব। রবীনদা বলে দিলেন দুই নিয়ম। এক, পূজা ঢাকার প্রথা মেনে বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিতে হবে। দুই, যে কোন শর্তেই বন্ধ করা যাবে না পূজা। মাস দুই তিনের মধ্যেই পূজার ব্যবস্থা হল। বাবার মেজমামিকে (কোন্নগরেই উনি থাকতেন, চৌধুরী বাড়ি থেকে একটু দূরে) জানালাম – উনি এসে বললেন যা দিয়ে পূজা আরম্ভ হবে সেই পরিমাণ বজায় রাখতে হবে – বাড়ালে বাড়ানো যাবে কিন্তু পরের বছর খেয়াল খুশি সেটা কমানো যাবে না। এছাড়াও তিনি পূজার পারিবারিক অনেক বিধি বললেন।

প্রশ্নঃ কেমন ছিল সেই পূজার ব্যবস্থা? দুই মাসেই হয়েছিল, না কি?

উত্তরঃ 'মুকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্'

মায়ের আশীর্বাদে কি না হয়? প্রতিমা এলো কালীতলার উলটো দিকের প্রহ্লাদ মৃৎ শিল্পালয় থেকে। পালবাবু মারা গেলেও আজও একই ভাবে ২৫ তম বর্ষেও তাঁর ছেলে শ্রী বিশ্বজিৎ পাল বানান প্রতিমা।

হাজরা এন্ড কোম্পানি থেকে হল লাইটের ব্যবস্থা। শেওড়াফুলি থেকে বর্ধমানের রায়না গ্রামের ঢাকি নিয়ে আনল মনু। ঝর্ণার মা দায়িত্ব নিলেন শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের, পঞ্চমী থেকে একাদশী পর্যন্ত। আগেই বললাম, পূজারি ছিলেন আশুদা, পরের পনেরো বছর তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন একইভাবে। তন্ত্রধারক ছিল বন্ধনার দাদা (শ্রী বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য)। প্রথম লুচি ভোগ রান্না করেন বাবু (সঞ্জয় চ্যাটার্জী) এর মা।

শ্রীশ্রীদেবীর রাঙা চরণ

প্রশ্নঃ আর, নৈবেদ্য কি হবে? কি দিয়ে পূজা হবে?
উত্তরঃ বাড়ির গাছ থেকে ৫১ – ৬০ নারকেলের নাড়ু করলাম। ৫ কেজি খই এর মুড়কি। ৩০ কেজি আতপচালের নৈবেদ্য। আনা হল ফল, ফুল, ধূপ, ধূনা – মিষ্টি হিসাবে দেওয়া হল প্যাড়া। শুরু হয়ে গেল পায়ে পায়ে পথচলা।
প্রশ্নঃ তাহলে এই হল "পায়ে পায়ে পঁচিশ"? পূজার প্রথম দিনের আনন্দটা ঠিক কেমন ছিল?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আনন্দ তো ছিলই। মা এলেন এত সাধনার পর। এই যে বড় আনন্দ। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল এক তীব্র না পাওয়ার দুঃখ। ষোলো বছর আগে, ১৯৮৩ সালের ৫ই এপ্রিল, বুধবার, অন্নপূর্ণা পূজার দিন আমার গর্ভধারিণী মা চলে গেছেন আমাদের সকলকে ছেড়ে। সেদিন ওনার বাড়িতেই হল দুর্গা পূজা, পূজা দিতে যেতে হল না মন্ডপ। কিন্তু, উনি নিজেই নেই আর। হয়তো আছেন, সূক্ষ্মভাবে, আমাদের চর্মচক্ষুর আড়ালে! আজকে মায়ের শুধু নয়, দাদু, ঠাকুমা পূর্বপুরুষ সকলের আশীর্বাদে আমরা "পায়ে পায়ে পঁচিশ"-এ।
প্রশ্নঃ বললেন ঢাকার নিয়ম। ঢাকাতেও আপনাদের পূজা ছিল?
উত্তরঃ এবার, তাহলে একটু ইতিহাস শুনুন। দাদুর (প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরদাদা) মুখে শুনতাম, "ঢাকায় দু'শো বছরের পূজা আমাদের"। কিন্তু, আমরা তো ঢাকার লোকই নই, তাহলে? আমার দাদুর আদি বাড়ি হাওড়ার রামরাজাতলার ধাড়সায় চৌধুরী পাড়া লেন। শ্রীবঙ্কিম বিহারী চৌধুরীর ছেলে তুলসী (শ্রী তুলসী চরণ চৌধুরী, মৃত্যু ১৯৭৬), আমার দাদু। খুব ছোট বেলায় মাত্র সাত বছর বয়সে বাবা ও মা উভয়কেই হারান। তাঁর মাসি ছিলেন ঢাকার কাশ্যপ গোত্রের দে পরিবারের গৃহবধূ। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। সদ্য অনাথ দাদুকে নিয়ে যান ঢাকায়, সন্তান স্নেহে মানুষ করেন তিনি। অত্যন্ত ছোট বয়স থেকে ওই দে পরিবারে থাকতে থাকতে দাদু ধীরে ধীরে ওই পরিবারেরই একজন হয়ে যান। পরবর্তীকালে মাসি তাঁর জায়ের মেয়ে গৌরী দের সাথে বিবাহ দেন দাদুর; ওই দে পরিবারের মেয়েই আমার ঠাকুমা। ঢাকায় দে পরিবারের দু'শো বছরের দুর্গাপূজা। পূজা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পান আমার দাদু এবং গৌরী দেবী (পরবর্তীকালে আমার ঠাকুমা গৌরী চৌধুরী)। সেখান থেকেই দাদু বলতেন, "ঢাকায় আমাদের বাড়ির পূজা দু'শো বছরের।"
প্রশ্নঃ আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু কেমন ছিল সেখানকার পূজা? জানেন কিছু?

উত্তরঃ দাদু, ঠাকুমা সেখানের পূজার অনেক গল্প করেছিলেন। বড় বড় নৌকায় করে আসতো দু'শোর উপর নারকেল। (চোখে জল নিয়ে, আবেগঘন গলায় -) আমার ঠাকুমা সেখানে দেবীর সামনে সন্ধি পূজার সময় ভিজা কাপড়ে বসে মাথায় আর দুই হাতে কাপড়ের বিড়া করে ধুনাচি ধরতেন, দাউ দাউ করে জ্বলত আগুন, সেই আগুনে আহুতি দেওয়া হতো ধুনা। নবমীতে আখ বলি ও চালকুমড়া বলি হত।

সন্ধিপূজার সময় মাটির মালসায় পোড়ানো হচ্ছে ধুনা

প্রশ্নঃ কি সাংঘাতিক! আপনারা সেখান থেকে নিয়েছেন নিয়ম কিছু?

উত্তরঃ আমার ঠাকুমার করা সেই প্রথা মেনে সন্ধি পূজার সময় এখনও ধুনা পোড়ানো হয়। মাটিতে মালসায় (মাটির শরা) পাটশলাকা পোড়ানো হয় আহুতি দেওয়া হয় ধুনা। যখন আমরা কোন্নগরে পূজা শুরু করি, বলির প্রস্তাব উঠেছিল, আমি সম্পূর্ণ না করে দিই।

প্রশ্নঃ কেন? কোন বিঘ্ন হয়েছিল?

উত্তরঃ না, না। কোন বিঘ্ন হয় নি। কিন্তু, বলি হয় না।

প্রশ্নঃ পূজার বাধা বিঘ্ন এসেছিল কখনও?

উত্তরঃ রবীনদা বলেছিলেন – দুর্গা পূজা বন্ধ করা যাবে না। কোন বিপদেও এই পূজা বন্ধ হয় নি, হবে না – তখন অন্য কেউ পরিবারের পক্ষ থেকে পূজা করবেন। আপনাকে বলি দুই তিনটি ইতিহাস।

এক, - ২০০০ সালে দুর্গাতৃতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করে দীপ (পুত্র দীপ চৌধুরী)। তাহলে আনন্দ অশৌচ হয়। পূজা? পূজা তখন করেন অন্য ব্যক্তিরা। আমরা হাত দিই নি কিছুতেই।

দুই, - ১৮ই জানুয়ারী, ২০০৯ – মারা গেলেন বাবা (৪ঠা মাঘ, ১৪১৫)। কালাশৌচ হল। দেখতে দেখতে তার আটমাস একদিনের মাথায় কাকা দুর্গা প্রতিপদ তিথিতে মারা যান (১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৯; বাংলা ২রা আশ্বিন, ১৪১৬) – অর্থাৎ কালাশৌচ ও মরণাশৌচ এক সাথে! কি করে হবে পূজা? এলেন কুলপুরোহিত পণ্ডিত রবীনদা। পুরাতন বিধান – পূজা বন্ধ করা যাবে না কোন ভাবেই। বাড়িতে সাতজন, সকলে এক জায়গায়, এক ঘরে। পূজার মন্ডপ, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, ভোগ ঘর সব থেকে অনেক দূরে। এমনকি, খাওয়ার জলটাও আলাদা। অন্য সকলের খাবার স্থান ইত্যাদি স্থানে যাওয়া হত না – কোন জিনিস স্পর্শ করা হত না। পূজা হল একই নিয়ম একই মন্ত্রে কোন রকম সংক্ষেপ ছাড়া – বেজেছিল ঢাক সেই বছরও। তিন বোন – আত্মীয় - স্বজন – পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্যে পূজা

হল সমাপন। কিন্তু, রবীনদার পরামর্শে সংকল্প হয় আমাদের দুই ভাইয়ের নামে – অর্থাৎ, এবার পূজা হয় দুই শরিকের একত্রে।

তিন, - (কাঁদতে কাঁদতে বেদনাহত অবস্থায়) ২০১৮ সালে মারা গেল আমার ভাই মনু, সমর! আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। পূজা বজায় রাখার জন্য মাকে বার বার স্মরণ করলাম, যেন পূজা বন্ধ না হয়। ২০১৯ সালের পূজাক্ষণ উপস্থিত। দুই শরিকের পূজা! (করুণ, ভাঙা কণ্ঠে, বিদ্রূপের সুরে) আর কি, আর তো কোন বাধা নেই। পূজায় আমার ভ্রাতৃবধূ সানু (কাজলি) ও তাঁর ছেলে পাপাই (সায়ক) ও মেয়ে (সৃজা) পূজার কাজে হাত দিল না। পূজা করলাম আমরা তিনজন, বোনেরা ও অন্যান্য স্বজন। আবার পূজার সংকল্পে নাম পরিবর্তন হল। ২০২০ সাল থেকে আমার আর সানুর নামে দুর্গা পূজার সংকল্প হতে থাকে।

প্রশ্নঃ মা, আপনার সাধ পূরণ করলেন। এলেন আপনার বাড়িতে। যতই দুঃখ কষ্ট থাকুক, মায়ের আগমনে এক আনন্দের প্লাবন হয়। মায়ের কাছে এখনো ছোটবেলার মতো কোন আবদার বা বায়না, যাই বলুন, করতে ইচ্ছে হয় না?

উত্তরঃ মায়ের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা থাকে। আজও দশমীর বিসর্জনের সময়, বরণের পর, যাত্রা কালে বাড়িতে মায়ের হাত ধরে মা কে জানাই, “মা, যদি কিছু ভুল ত্রুটি করে থাকি, ক্ষমা করো। সকলকে নিয়ে যেন আমি শান্তিতে এবং সুখে বসবাস করতে পারি। তুমি যা কিছু দিয়েছ আমাদের জন-ধন-ঐশ্বর্য-সুখ-দুঃখ-আনন্দ-সম্পদ সবই তোমার। তাই তুমি নিজেই রক্ষাকর্ত্রী, মা। যা দিয়েছ তা রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো। আবার পরের বছর এসো। আমার পরবর্তী জনেরা এইস্থানে তোমার পূজা যেন করতে পারে তা রক্ষা করো। যা সম্পদ, সকলই তোমার, তুমি রক্ষা করো। আবার, পরের বার এসো।”

ভালো থাকবেন।

মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার,
মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছেন সকল ভার।।
(পড়ে) সংসার পাকে ঘোর বিপাকে যখন দেখবি অন্ধকার,
(দেখবি) অন্ধকারের বিপদ হতে মা যে করেছেন উদ্ধার।।
ভুলেও থাকি তবুও দেখি ভোলেও না মা একটি বার,
(বড়) স্নেহের আধার, মা যে আমার, আমি যে মা'র মা আমার।।

-মনোমোহন চক্রবর্তী

থাকো মম সাথে

পঞ্চানন সিংহ

থাকো মোর সাথি হয়ে, থাকো অনিবার
অতি দ্রুত আসে দেখো সান্ধ্য অন্ধকার।
মরণের আভাস ক্ষুদ্র দিয়ে যাও ওই
তোমা সঙ্গ ছাড়া যেন কভু নাহি হই।
যখন সাহায্যকারী আর নাহি পারে
সকল সুখের স্বাদ পলকেতে ঝড়ে।
অনাথের নাথ তুমি, নাথ তুমি মোর
থাকো তুমি সাথে মম, এ জীবন ভোর।

চঞ্চলার মত ধায় জীবনের দিন
পার্থিব সকল সুখ হয়ে যায় ক্ষীণ।
অপ্রতিহত হইয়ে দিবস পলায়
জগত পরিবর্তিত ক্ষীণ হয়ে যায়।
ক্ষণমাত্র কৃপা দৃষ্টি নাহি চাহি আমি
অভিন্ন হৃদয় মম হও ভবস্বামি।
ক্ষণ মাত্র থাক সাথে, ক্ষণে দূর হও-
এ নহে প্রার্থনা মোর, তুমি সদা রও।
শিষ্যগণ মাঝে তুমি যেভাবে যেমন
আপন পরাণ খুলে কহ বিবরণ।
সেভাবে তেমন তুমি আমার এ মনে
কও কথা জ্ঞাতি মম সদা সর্বক্ষণে।
পরিজন মতো হয়ে থাকো মম সাথে
দিও গো তাদেরই মত স্নেহাশীষ মাথে।
প্রতি পলে হেরি তোমা বাসনা আমার
আঁখি সহ খুলে দাও হৃদয় দুয়ার।

কেবা আছে তোমা সম রক্ষক আমার
রক্ষিতে বিপদ হতে তোমা ছাড়া আর।
থাক তুমি সাথে মম সদা সাথী হয়ে
ভ্রম মোর দূর কর মোহ সব লয়ে।
অরাতি সে অতি তুচ্ছ পেলে স্নেহাশীষ
বিষাদের আঁখিধার হোক আশিরিষ।
মৃত্যুর করাল গ্রাস কিবা তাতে ক্ষতি
তুমি যদি থাক সাথে ওহে ভবপতি।।

দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান

দীপ চৌধুরী

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা শরৎকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব। শ্রী রামচন্দ্রের জন্য ব্রহ্মা যে অকাল বোধন করেছিলেন সেই রীতি অনুসরণ করে আজও দুর্গোৎসব। দুর্গা যিনি সমস্ত জীবের দুর্গতি নাশ করেন, মতান্তরে, 'দুর্গম' নামক দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন তাই তিনি দুর্গা। দুর্গাপূজা বঙ্গদেশের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। 'খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিখ্যাত স্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য "দুর্গাপূজাতত্ত্ব" নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার যে-সম্পূর্ণ বিধি দেন এবং ষোড়শ শতকে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের (যিনি বঙ্গদেশে প্রথম প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন) রাজ-পুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী যে পূজাপদ্ধতি রচনা করেন বর্তমানে তা অনুসৃত হয়।'

মুখ্যতঃ তিনটি মতে এই পূজা দেখা যায় – বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত পদ্ধতি, দেবী পুরাণোক্ত পদ্ধতি, কালিকা পুরাণোক্ত পদ্ধতি। আর একটি আছে, অপ্রচলিত – মৎস্য পুরাণোক্ত পদ্ধতি। চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজায় এদের মধ্যে প্রথমটি পালন করা হয়। যখন কোন্নগরের বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু হয়, তখন বৃহন্নন্দিকেশ্বরের পক্ষে বিধান দেন পরিবারের তৎকালীন পূজারী স্বর্গীয় রবীন্দ্র নারায়ণ গৌতম মহাশয়, এবং বাংলাদেশে জ্ঞাতিতে যে দীর্ঘ ২০০ বছরের পূজা ছিল সেটিও এই পদ্ধতিই ছিল এমনই ঘোষণা করেন তিনি।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে (যা অনেকে দেবীপক্ষও বলেন অনেকে) ষষ্ঠীতিথিতে শুরু হয় এই পূজার আরাধনা। চলে দশমী পর্যন্ত। একাদশীর দিন শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পূজা করা হয় শ্রীশ্রীদেবীর বেদিতেই। এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় দুর্গাপূজা। প্রতিদিনের পূজা নিচে সংক্ষেপে লেখা হল।

১. ষষ্ঠীর সকালে – অকাল বোধন অর্থাৎ, বেলগাছের মূলে অকালে বোধন – জাগানো, দেবী নিদ্রিতা তাঁকে জাগানোর জন্য উপযুক্ত সময় সায়ংকাল – 'আশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ'। কিন্তু, আমাদের পূর্বপুরুষের নিয়মে দেখা যায়, 'আশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং প্রভাতে বোধয়ামি বৈ'। তাই, ষষ্ঠীর সকালে মোট চারটি সংকল্প নিয়ে শুরু হয় পূজা – মূল পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ (পাঠক করেন), দুর্গানাম জপ, বোধন -এর সংকল্প। একইসঙ্গে সম্পাদিত হয় কল্পারম্ভ ও বোধন, শ্রীশ্রী দুর্গার ষোড়শোপচারে পূজা, আরতি এবং ওই এক আসনে শুরু হয় শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ষোড়শোপচারে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের পূজা ও পাঠ। না, আমাদের বাড়িতে শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবীর পূজা হয় না।

২. ষষ্ঠীর সন্ধ্যে – আগে বেঁধে নেওয়া হয় নবপত্রিকা। সন্ধ্যা বন্দনা করে শুরু

দেবীর আধিবাস করা হচ্ছে

হয় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। বেলডালে সিন্দুর চিহ্ন দিয়ে আমন্ত্রণ করা হয়, এবং গন্ধাদি ২৪ মাঙ্গলিক দ্রব্যে দেবীর মাথায়, বুকে ও পায়ে স্পর্শ করিয়ে করা হয় অধিবাস।

৩. মহাসপ্তমী – বিল্বমূলে গায়ত্রী উপাসনা করে, নারায়ণ স্নান ইত্যাদি করে বেল ডাল কর্তন করা হয়। ঐ ডাল নবপত্রিকায় এবং মূল ঘটে দেওয়া হয়। তারপর পরিষ্কার জলে স্নান করানো হয় নবপত্রিকাকে। আগে আমাদের গঙ্গায় ঢাক বাজিয়ে নিয়ে গিয়ে স্নান করানোর রীতি ছিল এখন সে আর লোকাভাবে

শ্রীশ্রী দেবীর মহাস্নানের দ্রব্য

করা হয় না। তারপর মন্ত্রপূত জলে স্নান, নবপত্রিকা স্থাপন। শুরু হয় দেবীর মহাস্নান, একটি দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বে দেবীর রূপ বিশেষ ভাবে চিন্তন করে তাতে ৭০ এরও অধিক জল, মৃত্তিকা, তেল, হলুদ, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, চন্দন, অগরু, সুগন্ধি দিয়ে করানো হয় স্নান। তার সঙ্গে সঙ্গে করা হয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত মন্ত্রপাঠ। এই স্নান এত বিশাল এবং এত সুখদৃশ্য যে ভোরবেলা দেবীর মহাস্নান দর্শন করলে মন ভরে যায় যেকোনো ভক্তেরই।

শ্রীশ্রীদেবীর মঙ্গলঘট

তারপর, শুরু হয় মূল পূজা। ঘটস্থাপন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় তারপরে। পূজারি মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে নিজের ভক্তিতে নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন মাটির মূর্তিতে। তাই, মৃন্ময়ী মা হন চিন্ময়ী। তারপর দেবীকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। শ্রীগণেশ, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসরস্বতী, শ্রীকার্তিক, মহাসিংহ, মহিষাসুর, শ্রীশিব, শ্রীনারায়ণের পূজা হয় ষোড়শোপচারে। শেষে ভোগ ও ভোগারতি দেখানো হয় দেবীকে। সন্ধ্যে বেলায় দেবীর আচমনাদি করিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং সন্ধ্যা আরতি করা হয়।

৪. মহাষ্টমী – অষ্টমী অতি পবিত্র এক তিথি। সকালে সপ্তমীর মতো বিল্বমূলে পূজা করে মহাস্নান করানো হয় দেবীর ও নবপত্রিকার। তারপর, মূলপূজা। নয়টি ছোট ঘট এবং দশটি পতাকা স্থাপন করা হয়, তারপর দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা। তারপর অঙ্গদেবতার পূজা, আবরণ পূজা; আবরণে প্রতিমাস্থ দেবতা থেকে শুরু করে চতুঃষষ্টি যোগিনী, কোটি যোগিনী, অষ্টশক্তি, নবদুর্গা, ভৈরব, দেশবাসিনীর পূজা হয়। পূজা শেষে পুষ্পাঞ্জলি,

মহাষ্টমীর পূজা চলছে

ভোগারতি হয়।

৫. সন্ধিপূজা – অষ্টমী ও নবমী থেকে এক দণ্ড (২৪ মিনিট) করে সময় নিয়ে ৪৮ মিনিটের অতি পবিত্র ও শুভক্ষণে শ্রী শ্রী চামুণ্ডাদেবীর মহাপূজা সম্পাদিত হয়। 'সন্ধিপূজার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়, সন্ধির অষ্টমীভাগের পূজায় দেবীর বর্ষব্যাপী পূজার আর নবমী ভাগের পূজায় দেবীর কল্পকালের পূজার তুল্য-ফল হয়।' মায়ের ধ্যান -

ওঁ হ্রীং শ্রীং নীলোৎপলদলশ্যামা
চতুর্বাহু সমন্বিতা।
খট্টাঙ্গং চন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতী
দক্ষিণে করে।।
বামে চর্ম চ পাশঞ্চ
ঊর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ।
দধতীং মুণ্ডমালাঞ্চ
ব্যাঘ্রচর্মধরাম্বরা।
কৃশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা
অতিদীর্ঘাতি ভীষণা।
লোলজিহ্বা নিম্নরক্ত
নয়নারাবভীষণা।।
কবন্ধ বাহনাসীনা
বিস্তারাশ্রবণাননা।
এষা কালী সমাখ্যাতা
চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে।।

এই অতিদীর্ঘাতি ভীষণা কালি চামুণ্ডার তন্ত্রোক্ত বিধানে পূজা ন্যাসাদি করে ষোড়শোপচার নিবেদন করা হয়। আন্ত্রিক রীতি মেনে এখানে শঙ্খের অর্ঘ্যপাত্র না দিয়ে তামার পাত্র দেওয়া হয়।

আর হয়, নবপত্রিকার পূজা, প্রতিমাস্থ দেবতার পূজা, চতুঃষষ্টি যোগিনী, কোটি যোগিনীর পূজা। পূজা শেষে দেবীকে প্রীত করার জন্য ভোগরাগাদি ছাড়াও নিবেদিত হয় ১০৮ পদ্ম –

ওঁ কমলোপস্থিতাং দেবীং
পরব্রহ্মস্বরূপিণিং।
গৃহাণ কুসুমং পদ্মং
কৃপয়া পরমেশ্বরি।।

- হৃদয়কমলের উপর অবস্থিতা পরব্রহ্মস্বরূপিণি পরমেশ্বরের শিবের শক্তি

সন্ধিপূজা চলছে

দেবী দয়া করে পদ্ম কুসুম গ্রহণ করুন।

আর, ১০৮ দীপমালা উৎসর্গ করে পূজারি দেবীর নিকটে প্রার্থনা করেন যেন তিনি সংসারের কলুষতা নাশকরে ভক্ত হৃদয়ে নির্মলতা দান করেন –

ওঁ সংসারধ্বান্তনাশায়
পবিত্রজ্যোতিরাপ্তয়ে।
দত্তেয়ং গৃহ্যতাং দেবী
কৃপয়া দীপমালিকা।।

নবমীর দিন সম্পাদিত বৃহদ তান্ত্রিক হোমাগ্নিতে বিল্বপত্র আহুতি দেওয়া হচ্ছে

- হে দেবী, সংসাররূপ অন্ধকার নাশ করবার জন্য এবং পবিত্র জ্যোতি প্রাপ্তির জন্য এই দীপমালিকা কৃপা পূর্বক গ্রহণ করুন। অর্থাৎ, সংসারের মায়ামোহের

সন্ধিপূজার দীপমালা

ফলে মনে যে অজ্ঞানতার অন্ধকার রয়েছে, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দেবী তা কৃপা করে দূর করে দিন - এই প্রার্থনা।

পূজা চলাকালীন পাঁচটি মাটির নূতন শরায় পাটকাঠি জ্বালিয়ে তাতে ধুনা আহুতি দেওয়া হয় প্রথা অনুসারে। তবে এই প্রথা পূজার মূল পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলে পূজক বা তন্ত্রধারকের কোন ভূমিকা থাকে না।

পরিশেষে পূজারি পাঠ করেন মহাভারত থেকে অর্জুনকৃত শ্রী শ্রী দুর্গা স্তোত্রম্ এবং শ্রী শ্রী আদ্যা স্তোত্রম্।

৬. মহানবমী – সমস্তপূজা অর্চনাই অষ্টমীর মতো, কেবল অপরাহ্ণে হোমের প্রথা রয়েছে। তান্ত্রিক বৃহদ্ হোমবিধির অনুসরণ করে হোম ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। শ্রীদেবীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় ১০৮ বিল্বপত্রে আহুতি। অন্যান্য সকল দেবতার হোমও একই সঙ্গে সম্পাদন করা হয়।

শিল্পী - ঊপায়ন পাল

মোট প্রায় ৩০০ টি বিল্বপত্রে আহুতি দিয়ে পান কলা ইত্যাদির পূর্ণাহুতি দিয়ে এই বৃহদ এই হোম সম্পন্ন হয় –

ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিণ্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকা-ল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।

নবমীর পূর্ণাহুতির সাথে দক্ষিণান্তে শেষ হয় দুর্গোৎসব, ইচ্ছা হয় মাকে বলি যেতে না। কিন্তু সময় এগিয়ে যায়, মায়ের বিদায় মুহূর্ত নিয়ে আসে দশমী। তাই তো মন গেয়ে ওঠে –

বলিস দু'দিন থাকতে হেথা
কালকে ভোলা নিতে এলে –
কিন্তু কই! ভোলা যে শোনার পাত্র নন।

৭. দশমী – ভারাক্রান্ত মনে যখন অন্যান্য পূজা শেষ করে কচুশাক ও গন্ধরাজ লেবু দেওয়া নৈবেদ্য দেওয়া হয় অচিরেই জল আসে ভক্তনয়নে। সকল দেবতাদের একত্রে নিবেদন করা হয় দধিকরম্ভ নৈবেদ্য (অপভ্রংশ - দইকরমা), বিজয়া (সিদ্ধি), বারাণসী পান। শঙ্খপাত্র হাতে নিয়ে স্তবপাঠ করতে করতে আবর্তন করেন পূজারি, শেষে সংহার মুদ্রায় দেবীর ঘটের পুষ্প থেকে ঘ্রাণ নিয়ে দেবীকে নিজের হৃদয়ে প্রতিস্থাপন করেন। সমাপ্ত

শ্রীশ্রীদেবীর বরণ

হয় শারদোৎসব। সকল নারীরা দেবীর বরণ করেন। সন্ধ্যে বেলা নৃত্য-গীতের মাধ্যমে দেবী প্রতিমাকে বিসর্জিতা করা হয়। বিসর্জনের পর ভরে আনা হয় মূল ঘট, সেই জল শান্তিবারি রূপে দেওয়া হয় ভক্তদের। আর ... বিশ্বজননী পরের বছর পর্যন্ত হৃদিমন্দিরে আসীনা থেকে পূজা গ্রহণ করেন, এবং মঙ্গল বিধান করেন ভক্তদের। ভক্তরা সমবেত স্বরে গেয়ে উঠে -

একবার বিরাজ গো মা হৃদিকমলাসনে...
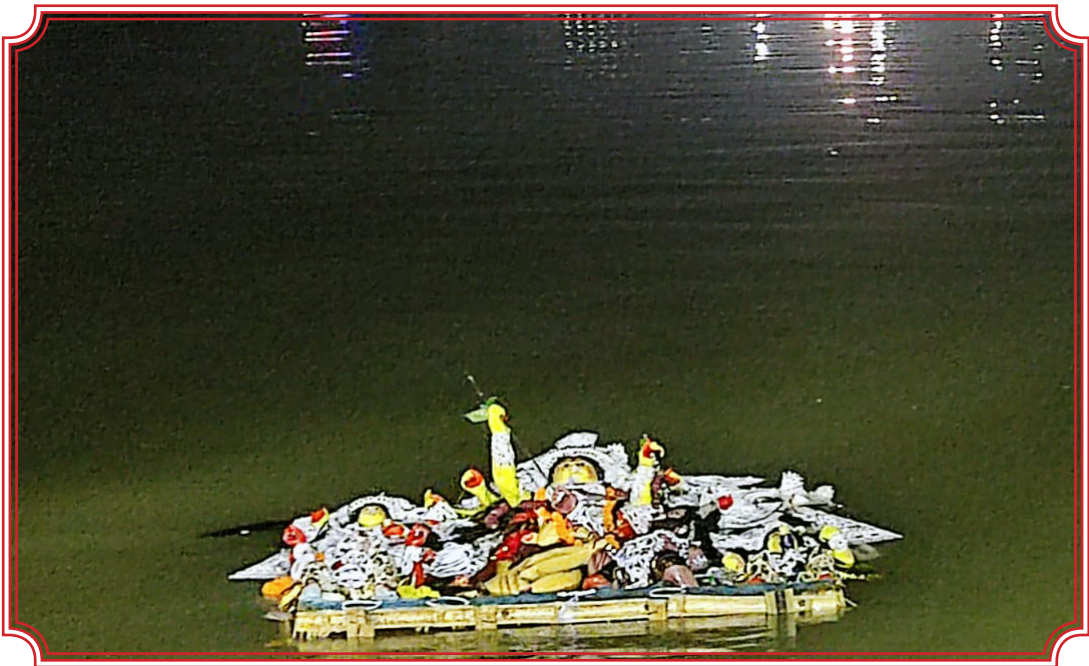
শ্রীশ্রীদেবীর প্রতিমা গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিতা - সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি

শুভ্রজিৎ বসু

ঊনবিংশ শতকের তিনের দশকের তমসাচ্ছন্ন ভারতীয় আকাশ,
যম কালো মেঘের বুক চিরে ভারতভূমিতে আছড়ে পড়েছে বিপর্যয়ের বজ্রপাত।
আধুনিক এক বাঙালি কবি লিখেছেন--ভারতবর্ষের আকাশ নাকি চিরকালই থমথমে।
তিনি সুবোধ না দুর্বোধ, জানা নেই, তবে এর আগেও
এই থমথমে ভারতীয় আকাশেই ঘনিয়েছে মহাদুর্যোগ,
নিষ্ঠুর নির্মম অগ্ন্যুৎপাতে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে
কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন এই ভারতীয় সভ্যতাকে।

এইবার বোধ হয় সবাই ভেবেছিল মৃত্যুঘন্টা আসন্ন।
প্রমাদ গুনেছিল গণকেরা, কেউ বা হেসেছিল প্রতিহিংসার বক্রনির্মম অট্টহাসি।
ধরিত্রীমাতা হয়েছিলেন ভীত, কারণ হাজার হাজার বছর ধরে
এই গ্রহে সৃষ্টিকে লালন করার জন্য বিধাতা নির্মাণ করেছিলেন ভারতবর্ষকে।
দুর্দম বর্বর দুরাত্মাদের চক্রান্তে কি তবে শেষ হয়ে যাবে এই সভ্যতা
এবং একই সাথে তিলে তিলে এই পৃথিবী গ্রহ --
কেননা ভারতের কল্যাণেই তো জগতের কল্যাণের বীজ নিহিত ছিল।

মুনিঋষিগণ বসলেন গভীর অটল তপস্যায়।
চলল অনেক হোমযজ্ঞ-স্তবস্তুতি, প্রার্থনা।
এই গ্রহকে বাঁচাতে হলে আবার জেগে উঠতে হবে ভারতমাতাকে।
ঘনঘোর আঁধারের বুক চিরে জ্বালাতে হবে নূতন মহিমার আলো।
তবেই রক্ষা পাবে এই সৃষ্টি, এই গ্রহ।

চিত্র - সংগৃহীত

অবশেষে সেই ক্ষণ সমাগত হ'ল।
বিশেষ সমস্যার সমাধানকেও বিশেষ হতে হয়।
তাই কোন এক বাসন্তী শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার রাতে
ভারত গগনের পূর্বাকাশে চাঁদের বদলে উদীয়মান হল এক মহাসূর্য।

এ সূর্য সকালের সূর্যের চেয়েও প্রখর-দীপ্ত
আর গভীর নিশীথের জ্যোৎস্নার চেয়েও স্নিগ্ধ।
এমন মহাসূর্য আগে কেউ কখনো দেখেনি।
কেউ কেউ বলল "জ্যোতির-জ্যোতি", এর আলোতেই
নাকি আলোকিত আকাশগঙ্গা ছায়াপথ আর সৌরমণ্ডলের গ্রহ নক্ষত্ররাও,
এর প্রভাদানেই নাকি 'প্রভা পায় প্রভাকর'।
সকলেই বন্দনা করতে শুরু করল এই মহাসূর্যকে,
প্রার্থনা করতে লাগল পরিত্রাণের জন্য,
বিশেষ করে ভারত ভূমির প্রাচীন অধিবাসীরা,
কারণ সূর্য উপাসনাই তো তাদের বহমান অভ্যাস।

মহাসূর্য অভয় দিল সকল জীবকে, রোপণ করল সত্যযুগের বীজ।
সাথে এনেছিল আরো কত নক্ষত্রকে, তারাও একে একে দেবে
আগামীর আলো, পুড়িয়ে দেবে দুর্যোগের নিকষ-কালো মেঘরাশিকে।
দারুণ যুদ্ধ চলল মহাকাশে, সেই যুদ্ধে গেল কত প্রাণ,
এক অনিবার্য উল্কার আঘাতে ভারতভূমি দুখণ্ড হ'ল, তবুও
সেই মহাসূর্য বলল-- ভয় নেই, তার চৌম্বক আকর্ষণে
নাকি আবার জোড়া লাগবে এই খণ্ডসমূহ।
আবার জেগে উঠবে এই প্রাচীন সভ্যতা নূতনের মহিমায়।

মহাসূর্য আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে মধ্য আকাশের দিকে।
আরো প্রখর হচ্ছে তার তেজ, আরও স্নিগ্ধ হচ্ছে তার আভা।
ঋষিগণ উচ্চারণ করছেন-- হে সর্বপাপঘ্নং সূর্য!
তুমি না এলে এই ভারতভূমি আরো খণ্ডিত হতো
শয়তানের ইন্ধনে, ভণ্ডের প্রতারণায় আর মূর্খদের প্রগলভ আচরণে।
তুমিই রক্ষা করলে এই গ্রহকে প্রভু। তোমার জয় হোক।
দেড় হাজার বছর ধরে এই গ্রহের পূর্ব গগনে তুমি উদীয়মান থেকো।
তোমার প্রভাদানে সঞ্জীবিত হোক জীবজগত।
তার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করুক ভারতবর্ষ।

গ্রীষ্মজুড়ে তালপুকুরে

পারিজাত চট্টোপাধ্যায়

গরমকালে রোজ সকালে
তালপুকুরে আমি,
বাবার সাথে দাদার সাথে
সাঁতার দিতে নামি।
ক্লাস নাইনে পড়ে দাদা
আমি কেলাস থ্রিতে,
চিৎ-সাঁতারে দাদাই দেখি
প্রতিদিন যায় জিতে।
হারছি বটে, তবু আমি
ছাড়ছি নাকো হাল।
রোজ সকালে কাটবো সাঁতার
গোটা গরমকাল।

শিল্পী - দেবমাল্য লাহা

কেমন হয় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

তাপসী চৌধুরী ও
কাজলি চৌধুরী

ভাণ্ডার হয় দুইটি – একটি শ্রী শ্রী দুর্গা ভাণ্ডার, ওখানে ব্যবস্থা করা হয় পূজা সামগ্রীর এবং, অপরটি হল শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, যেখানে ব্যবস্থা করা হয় অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে সমস্ত আগত ভক্তের মুখে প্রসাদ তুলে দেওয়ার। এখানে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের দায়িত্বে থাকা পরিবারের দুই সদস্যা (গিন্নী) তাপসী চৌধুরী ও কাজলি চৌধুরীর প্রশ্নোত্তর দেওয়া হল।

প্রশ্নঃ অতিথি সংখ্যা কেমন হয়?

উত্তরঃ ষষ্ঠীতে একটু কম। কিন্তু সপ্তমী থেকে নবমীতে দুই বেলা মিলিয়ে প্রায় সত্তর (৫০ + ২০) জন থাকেন। দশমীতে প্রায় একশ (৭০ + ৩০) জন থাকেন। একাদশীর দিন প্রায় চল্লিশ জন ভোগ খান।

প্রশ্নঃ কেমন কেমন রান্না হয়?

উত্তরঃ ষষ্ঠীতে কেউ কেউ ষষ্ঠীপূজার নিয়ম অনুসারে চাল খান না। তাই তাঁদের জন্য লুচির ব্যবস্থা করতে হয়। বাকিরা নিরামিষ ভাত, ডাল, ভাজা, দুই রকমের তরকারি, চাটনি খান। সপ্তমীর দিন সকলেই ষষ্ঠীর মতো খান। অষ্টমীর দিন সকলেই লুচি, ডাল, বেগুন ভাজা, তরকারি, চাটনি এবং সুজির পায়েস খান। নবমীতে সপ্তমীর মতোই রান্না হয়। দশমীতে থালা সাট (একটি লোকাচার) -এর পর, রান্না হয় শাক ভাজা, শুক্তো, ডাল, তরকারি, মাছ, চাটনি, পায়েস। একাদশীতে হয় ঠাকুরের প্রসাদী চাল দিয়ে খিচুড়ি, ঘণ্টের তরকারি, বেগুনী, চাটনি এবং পায়েস।

প্রশ্নঃ সবই কি নিরামিষ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, কেবল দশমীতেই মাছ হয়। কিন্তু সেটাও পেঁয়াজ ও রসুন ছাড়া।

প্রশ্নঃ আপনাদের নবমীতে মাংস ভোগ হয় না?

উত্তরঃ এই বাড়িতে সেই নিয়ম নেই। উপরন্তু, বাড়িতে পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত আমিষ দূর কথা, পেঁয়াজ, রসুন ও মুসুর ডালও রান্না করা হয় না। আবার, কেউ পোড়া রান্না, যেমন – রুটি, মুড়ি ইত্যাদি খান না।

প্রশ্নঃ কেউ অসুস্থ হলেও কি নিয়ম পালন করতে হয়?

উত্তরঃ ঠাকুরের আশীর্বাদে আমাদের এত বছর এই নিয়ম পালন করতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু, শরীর আগে। তাই, ডাক্তারের পরামর্শ থাকলে অবশ্যই সেটা পালন করতে হবে। পূজার নিয়মের থেকেও ডাক্তারের বিধান আগে।

প্রশ্নঃ রান্না কারা করেন?

উত্তরঃ পূজার ষষ্ঠী থেকে একাদশী পর্যন্ত একজন সহকারী সহ একজন রান্নার লোক থাকেন, সঙ্গে সমস্ত পূজার বাসন মাজা ও পূজার ঘরের কাজ সামলানোর জন্য অন্য একজন বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ করা হয়। কারন, আগে থেকে কাজ গুছিয়ে রাখলেও দিনের দিন একটু প্রয়োজনে তিনি ব্যবস্থা করেন। আমরা পূজার দিক ও এই আপ্যায়নের দিক উভয়েই সামলাই।

প্রশ্নঃ ক্যাটারারের ব্যবস্থা করেন না?

উত্তরঃ করোনা চলাকালীন দুই বছর ও তার পরের এক বছর ক্যাটারারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু এখন আর করা হয় না।

প্রশ্নঃ তাহলে এত বাজার কি করে হয়?
উত্তরঃ রাঁধুনি ফর্দ দিলে, সেই ফর্দ অনুযায়ী বাড়ির ছেলেরা মশলা-চাল-ডাল-শুকনো জিনিস আগে কিনে এনে রাখেন। পরে, দিনের দিন কাঁচা সব্জি ও মাছ কিনে আনা হয়।
প্রশ্নঃ বাজার কোথা থেকে করা হয়?
উত্তরঃ মশলা ইত্যাদি শুকনো জিনিস আসে কোলকাতার বড়বাজার থেকে, আনাজ আসে শেওড়াফুলির হাট থেকে। অন্যান্য খুঁটিনাটি জিনিস ও মাছ আসে কোন্নগরের লোকাল বাজার থেকে।

চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ চক্রবর্তী

প্রশ্নঃ বললেন, একাদশীর দিন ভোগ হয়। অন্যান্য দিন কি ভোগ প্রসাদ হয় না?
উত্তরঃ হ্যাঁ, দেবীকে লুচি ভোগ নিবেদন করা হয় সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত। কিন্তু, মধ্যাহ্ন ভোজ খাওয়ার সময় সকলকে শুরুতে ফল, প্রসাদ-নাড়ু ইত্যাদি দেওয়া হয়। কিন্তু, একাদশীর দিন পূজার নৈবেদ্যর যে চাল হয় সেখান থেকে প্রয়োজন মতো নিয়ে খিচুড়ি রান্না করা হয়। আর, দৈনিক ভোগের লুচি আলাদা করে দেওয়া হয় সকলকে।
প্রশ্নঃ ঠাকুরের যে লুচি ভোগ হয়, তার কি ব্যবস্থা আছে?
উত্তরঃ একদম গোড়া দিকে, ব্রাহ্মণ/ব্রাহ্মণী দিয়ে ভোগ রান্না করার প্রচলন ছিল। কিন্তু, মায়ের সকল সন্তানই সমান, তাই এখন শুদ্ধভাবে, শুদ্ধমনে ও শুদ্ধাচারে সকলকেই জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে দেবীর ভোগ রান্নার কাজে নিযুক্ত করা হয়।
প্রশ্নঃ আচ্ছা, তাহলে প্রসাদ বিতরণ কি করে করা হয়?
উত্তরঃ প্রতিদিন দর্শন করতে যাঁরা আসেন তাঁদের সকলকে হাতে হাতে বিতরণ করা হয় প্রসাদ। এছাড়া, নবমী – দশমীতে প্রতিবেশীদের সকলের বাড়িতে বাড়িতে গোটা ফল, নাড়ু, মুড়কি, লুচি, মিষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে।
প্রশ্নঃ এই সমস্ত আয়োজন কি আপনদেরই করতে হয়?
উত্তরঃ হ্যাঁ, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে সহযোগিতা করেন বাড়ির সকল সদস্য। কেননা, দুর্গা পূজা দশ হাতের পূজা। তবে আমরা দুই জনই মুখ্য ভূমিকা পালন করি।
প্রশ্নঃ কোনদিন এই পঁচিশ বছরে বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করেছেন?
উত্তরঃ না, না। মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার মা নিজেই চালান। তাই, কোন দিনই কোন অসুবিধা, ঘাটতি বা সমস্যা কিছুই বোধ হয় নি।
প্রশ্নঃ শেষ প্রশ্ন, আপনারা কি কোন বিশেষ নিয়ম পালন করেন?
উত্তরঃ বিশেষ কি নিয়ম হবে তা তো জানা নেই। যা করে আসছি সেটাই নিয়ম। তবে হ্যাঁ, পরিচ্ছন্নতা, রান্নার সমস্ত গুণাগুণ বজায় রাখা, সহজ পাচ্য – সুষম খাদ্য পরিবেশন করার দিকে আমরা বিশেষ ভাবে যত্ন নিই। সকল শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষ যেন আগে খাওয়ার পান সেই দিকেও খেয়াল রেখে সকলের খাওয়া শেষ হলে আমরা দুই গিন্নী খাই। সেক্ষেত্রে, বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আমরা বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময়ও মধ্যাহ্ন ভোজন করেছি।
ভালো থাকবেন।

অতীতের কিছু স্মৃতি............

পুরাতন আলোকচিত্রের সংগ্রহ

শ্রী শ্রী দেবীর সামনে বসে শিবশঙ্কর চৌধুরী

ঢোল বাজাচ্ছেন জামাই স্বপন দাশগুপ্ত, ঢাক বাজাচ্ছে ছোট্ট সায়ক, কাঁসর বাজাচ্ছেন নীলু চৌধুরী, পাশে বসে বাড়ির মেয়ে কৃষ্ণা, সামনে দাঁড়িয়ে কর্তা শিবশঙ্কর চৌধুরী

দশমীর দিন নাচের কিছু মুহূর্ত

দশমীর বরণ করে সিঁদুর খেলায় দাঁড়িয়ে বাড়ির মেয়ে অর্নিতা (বুড়ি) ও দীপালি (মনা)
সঙ্গে তাদের মেয়ে মামন ও মান্তা

ঢাক বাজাচ্ছে ছোট্ট সায়ক, পাশে দাঁড়িয়ে
দীপ চৌধুরী

সন্ধিপূজা চলাকালীন ১০৮ দীপমালা প্রস্তুত করছেন সমর চৌধুরী ও
জামাই সমীর কুমার দে

শ্রী শ্রী দেবীর সামনে বসে দীপ, পাশে মা তাপসী চৌধুরী

শ্রী শ্রী দেবীর সামনে বসে ভাই-বোনেরা (বাঁ দিক থেকে) রুম্পা (মাম্পি), দাদু শিবশঙ্কর, (সামনে)সায়ক (বাবু), (কোলে) দীপ, রিয়াঙ্কা (মান্তা) ও সুস্মিতা (মামন)।

দশমীর বরণ করছেন তাপসী (দেবীর সামনে), (পিছন থেকে) কৃষ্ণা, অর্নিতা, দীপালি, কাজলী, পাশে জামাই সমীর, ঢাকের তালে নাচছে মান্তা
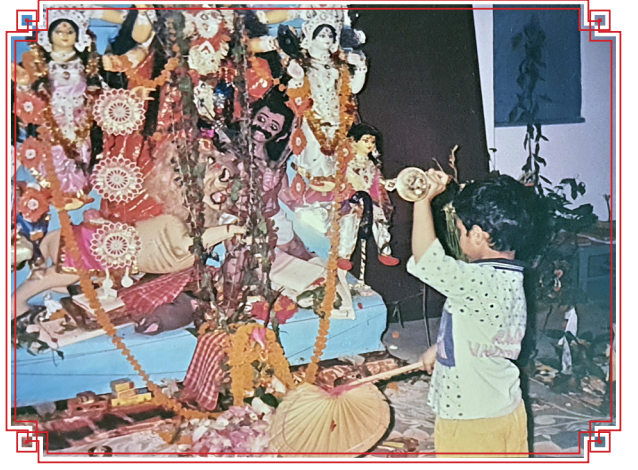
হাত পাখা দিয়ে আরতি করছেন ছোট্ট সায়ক

পূর্ণ পরিবার - (বাম দিক থেকে) কাজলি, তাপসী, দিপালী, কৃষ্ণা, সমর, স্বপন, প্রদীপ, এনাক্ষী, শুভ্রা (কাজলির ভ্রাতৃবধূ) এবং অর্নিতা

বিসর্জনের নৃত্যের তালে দুই জামাই - স্বপন ও দিব্যেন্দু

দশমীর বরণের পর সিঁদুর মেখে গীতা রানি বসু

হোম চলাকালীন - (বামদিক থেকে) শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য, দীপ (মাথায় পাগড়ি বেঁধে), সৃজা, সায়ক এবং প্রদীপ

শ্রী শ্রী দেবীর আরতি করছেন পূজক আশুতোষ ভট্টাচার্য। রয়েছেন (বাম দিক থেকে) গৌরী চ্যাটার্জী, ছায়া রানি সিংহ, কাজলি ও তাপসী। সামনে পায়েল সাহা এবং কোয়েল ঘোষ

শ্রী শ্রী দেবীর আরতি করছেন পূজক শ্রী কাঞ্চন মুখার্জী (২০১৬)

প্রথম বছর (১৯৯৯) শ্রী শ্রী দেবীর আরতি করছেন পূজক আশুতোষ ভট্টাচার্য। উপস্থিত রয়েছেন শিবশঙ্কর চৌধুরী, স্নেহলতা সেন, ছায়া রানী সিংহ, শুভ্রা বসু সহ বাড়ির অন্যান্য সদস্য

সন্ধিপূজা চলাকালীন ১০৮ দীপমালা

শ্রীশ্রীদেবীর আরতি করছেন পূজক শ্রী দুলাল মুখার্জী (২০১৭)

প্রথম বছর (১৯৯৯) শ্রী শ্রী দেবীর পূজা করছেন পূজক আশুতোষ ভট্টাচার্য

ঢাকের তালে (বাম দিক থেকে) জামাই দিব্যেন্দু, (কাঁসর হাতে) সমর, (ছোট্ট) দীপ, সৃজা, সৃষ্টি ও জামাই স্বপন

ইতিহাস

সংবর্ত তরফদার

পিছনেতে সব নয় ঝাপসা
আঁকা আছে হাসি আর ক্রন্দন,
কোথাও তো পথচলা আলগা,
কোথাও বা আঁটোসাটো বন্ধন।

সখ্যতা বয়সকে মানে না
সংকটে ঠিক তাকে কাছে পায়,
বন্ধুতা দূরত্ব জানে না
এতটা সহজে তাকে ছেঁড়া যায়?

জমা আছে কত কত গপ্প
উপচিয়ে পড়ছে বস্তা,
যে শিকড় পৌঁছেছে গভীরে
সে শিকড় ওপড়ানো সস্তা?

আগামীর হাতছানি শুনলে
হয়তো এগিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক,
ফেলে আসা পথে তবু পিছটান
সেও নয় মিথ্যে ও আণবিক।

সেই পথে গাঁটছড়া অগুণতি
স্মৃতিময় রঙচঙে ক্যানভাস,
ফাঁক পেলে হাবুডুবু স্বপ্নে
জেগে থাকে নির্দয় ইতিহাস।
বেঁচে থাকে নির্দয় ইতিহাস।।

পূজ্যাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে

শ্রী শ্রী দুর্গা ভাণ্ডার থেকে

পূজকে

বাঙালিদের সকল উৎসবের শ্রেষ্ঠ উৎসব শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা। কিন্তু, আনন্দ উৎসব ইত্যাদি ছাড়াও দুর্গাপূজা আসলে একটি পূজা, পাঁচদিনব্যাপী এক বিরাট সাধনার আয়োজন। দুর্গাপূজা চৌধুরী পরিবারে শুরু থেকেই বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের বিধানেই করা হয়ে থাকে। যাঁরা এই মহাকর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেন তাঁদের সত্যিই মাথানত করে নমস্কার জানাতে হয়। নিচে দুর্গাপূজার সমস্ত পূজারিদের নামের তালিকা দেওয়া হল।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৯৯ - ২০১৪)
শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ গৌতম (২০১৫)
শ্রী কাঞ্চন মুখার্জী (২০১৬)
শ্রী দুলাল মুখার্জী (২০১৭)
শ্রী শ্রীমন্ত চক্রবর্তী (২০১৮ - ২০১৯)
শ্রী দীপ চৌধুরী (২০২০ -)

দুর্গাপূজা কিন্তু কোন ছোট পূজার মতো নয়। তাই, পূজকদের ঘিরেও রয়েছে অনেক ঘটনা ও অনেক ইতিহাস। যেমন - চৌধুরী পরিবারে একটানা ১৫ বৎসর পূজা করেছিলেন শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য (আশুদা এবং বড়ঠাকুরমশায় নামে অধিক পরিচিত)। ২০১৫ সালে মহালয়ার দিন ভোরে রেডিও সেটে 'মহিষাসুরমর্দিনি' শুনছেন তিনি, কিন্তু হায়! সেরিব্রাল অ্যাটাকে বামদিক নিমেষে অবশ হয়ে গেল, হাসপাতাল-ঘর শুরু। এমন অবস্থায় ফোন এল বাড়িতে, বাড়ির সকল সদস্যের কপালে পড়ল ভাঁজ। কারণ- তাঁর পক্ষে পূজা অসম্ভব। অন্যদিকে, যিনি তন্ত্রধারক হিসেবে এতদিন নিযুক্ত ছিলেন শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য (উনি আশুদার ভাইপো সম্পর্কে। সকলেই তাঁকে ছোট ঠাকুরমশায় বলতেন) বাড়ির সকলের ভাবনা ছিল যে বড়ঠাকুরমশায়ের পরবর্তীতে ছোটঠাকুরমশায় ওই দায়িত্ব নেবেন; কিন্তু উনি বিশেষ কারণবশতঃ সরাসরি সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে দেন। বাড়িতে এল এক দুর্যোগ - এমনিই পূজাপদ্ধতি একটু অন্যরকম বলে পূজক পাওয়া যায় না, অন্যদিকে

শিল্পী - রিতীকা দত্ত

ছোট ঠাকুরমশায়ের না করে দেওয়া বাড়ির সকলকেই এক বিরাট সংকটে ফেলল। সেইদিন বিকালেই শ্রী প্রদীপ কুমার চৌধুরী (বাড়ির কর্তা) ও তাঁর স্ত্রী গিন্নী শ্রীমতি তাপসী চৌধুরী ছুটলেন কুলপুরোহিত শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ গৌতমের (রবীন দা) বাড়িতে। সমস্যার সাথে সাথে সমাধানও মোটেই ছিল না সরল। পথে এলো প্রবল ঝড় এবং তেমনই বৃষ্টি। এক ঘণ্টার উপর আটকে কোন্নগর স্টেশনে। পৌঁছে আরও এক বিপদ! রবীন দার ছোট ছেলে ২০১১ সালে হটাৎই হার্ট

শ্রী শ্রী দেবীর আরত্রিক করছেন শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য (বামদিকে উপরে), দর্পণ হাতে শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য (বামদিকে নিচে), নবপত্রিকা স্নান করাচ্ছেন শ্রী শ্রীমন্ত চক্রবর্তী (ডানদিকে উপরে), নবমীতে সন্ধ্যারত্রিক করছেন শ্রী দীপ চৌধুরী (ডানদিকে নিচে)

অ্যাটাকে মারা যান, তিনি আবার ছিলেন রবীন দার দুর্গা পূজার তন্ত্রধারক। তাই রবীন দা পুত্রশোকে প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কোনদিন করবেন না দুর্গাপূজা। প্রথমেই শুরু হল 'না' দিয়ে, কি দৃঢ়তা! গিন্নী তাপসী উপায় না পেয়ে পায়ে আশ্রয় নিলেন রবীন দার। অনেক, অনেক, অনেক 'কাকুতি-মিনতি' চলল, সাহায্য করলেন রবীন দার ভাই মনু দা ও তাঁর স্ত্রী। অবশেষে রাজি হলেন রবীন দা। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে দুর্গাপূজা করলেন তিনি। জয়ী হল তাপসী ও প্রদীপের নিষ্ঠা ও সাধনা, নাহলে হয়তো এতো সুন্দর পূজাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ে উঠতো না।

পরে পরে আরও পূজক এসেছেন, পূজা করেছেন। কিন্তু, আসন্ন দিনে এল পূজায় এক নূতন পরিবর্তন। সালটা ২০২০, করোনা মহামারিতে গোটা বিশ্ব উথাল পাথাল হচ্ছে, চৌধুরী পরিবার দুর্গা পূজাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু পূজক? মেদিনীপুর থেকে আসতে

শ্রীশ্রীদেবীর সন্ধিপূজা করছেন শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ গৌতম (২০১৫)

শ্রীশ্রীদেবীর হোমের পর পূজারী, তন্ত্রধারক ও শ্রীশ্রীদুর্গা ভাণ্ডারি

পারবেন না তৎকালীন পূজক শ্রী শ্রীমন্ত চক্রবর্তী মহাশয়। প্রস্তাব হল শ্রী শুভদীপ পূজক হবেন। প্রথমে একেবারেই রাজি নন শুভদীপ। কিন্তু, তাঁরও ছিল পূজার প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং চৌধুরী পরিবারের প্রতি গভীর আন্তরিকতা। অবশেষে রাজি হলেন, কিন্তু রাজি হলেন না তাঁর পিতা শ্রী মানিক চক্রবর্তী - তার যুক্তি যথেষ্ট শাস্ত্রসম্মত। মন্ত্রদীক্ষা না হলে শক্তিপূজার অধিকার জন্মে না, আর শ্রী শুভদীপ অদীক্ষিত। শ্রী মানিক বাবুই প্রস্তাব দিলেন পূজক হোক শ্রী দীপ, কেননা তিনি বহুবছর তন্ত্রধারকত্ব করেছেন, পূজাপদ্ধতির সংস্কারও তাঁর হাতেই এবং সর্বোপরি ২০১৭ সালে পূজনীয় স্বামী প্রভানন্দের থেকে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছেন তিনি। শ্রী মানিক বাবুর প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা হল পরিবারে। শুরু হল পূজার প্রস্তুতি। সঠিক ভাবে সুসম্পন্ন হল শ্রী শ্রী দুর্গা মহাপূজা। সাত কূলের ব্রাহ্মণের থেকে এলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বচন। সমর্থন এলো কুলপুরোহিত শ্রী পরেশ চন্দ্র গৌতমের (শ্যামুদা) থেকেও। এই ভাবে 'পায়ে পায়ে পঁচিশ' তম বর্ষে এসে পৌঁছেছে চৌধুরী পরিবার, একই রকম নিষ্ঠা-ভক্তি-অনুশাসনকে বজায় রেখে, শ্রী শ্রী ভগবানের আশীর্বাদ পেয়ে। আশা করি এরকম আরও যুগ যুগ এগিয়ে যাবে এই পূজা। এবারে আসা যাক তন্ত্রধারকের সম্পর্কে।

তন্ত্রধারক

শাস্ত্রীয় আচারে, তন্ত্রধারক হলেন সমস্ত পূজার মূলকর্তা। তাঁর নির্দেশ পালন করেন পূজারি। তবে সাধারনতঃ এই বিধির বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না। তন্ত্রধারক প্রকৃতপক্ষে ভাণ্ডারির ভূমিকা পালন করেন। ২০১৭ সাল থেকে চৌধুরী বাড়িতে তন্ত্রধারক ও ভাণ্ডারির কাজ পৃথক করে দেওয়া হয়। তন্ত্রধারকদের নাম নিচে দেওয়া হল।

শ্রী বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (১৯৯৯)
শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য (২০০০ - ২০০১)
শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের শ্যালক (২০০২)
শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য (২০০৩ - ২০১৬)
শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তী (২০১৭)
শ্রী দীপ চৌধুরী (২০১৮ - ২০১৯)
শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তী (২০২০ -)

এবারে আসা যাক শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠকে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠক

দুর্গাপূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ। নিচে চৌধুরী বাড়িতে যাঁরা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠক ছিলেন তাঁদের নাম দেওয়া হল।

শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীর আরত্রিক করছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠক

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৯৯ - ২০১৪)
শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ গৌতম ও শ্রী পরেশ চন্দ্র গৌতম (২০১৫)
শ্রী কাঞ্চন মুখার্জী (২০১৬)
শ্রী দীপ চৌধুরী (২০১৭)
শ্রী শ্রীমন্ত চক্রবর্তী (২০১৮ - ২০১৯)
শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তী (২০২০ -)

শ্রী শ্রী দুর্গা ভাণ্ডারি

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাকে কলিযুগের অশ্বমেধ যজ্ঞ বলা হয়। কিন্তু, এর আয়োজন ভীষণ বিস্তৃত এবং অতি বিচক্ষণ চিন্তাভাবনাপেক্ষ। তাই, বাড়ির সকলেই শ্রী শ্রী দুর্গা ভাণ্ডারি। কিন্তু, তাঁদের যিনি মূল তাঁকেই আমরা এখানে উল্লেখ করবো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোঁড়ার দিকে তন্ত্রধারকই ভাণ্ডার সামলাতেন। পরে ২০১৭ সাল থেকে

শ্রীশ্রীদুর্গাভাণ্ডার

আলাদা করে দেওয়া হয় ভাণ্ডারিকে। ২০১৭ সাল থেকে কখনো একজন, কখনো বা একাধিক ভাণ্ডারি দুর্গাপূজায় শ্রমদান করেছেন। তবে, ২০১৭ সাল থেকে শ্রী দীপ চৌধুরী দুর্গা ভাণ্ডারের এক বিরাট পরিবর্তন আনেন, যার ফলস্বরূপ দুর্গাভাণ্ডার অনেক বেশি systematic হয়ে যায়। প্রতি বছরই পুরোনো বছরের ত্রুটিকে সংশোধন করার প্রয়াসও দেখা যায়। নিচে শ্রীশ্রীদুর্গা ভাণ্ডারিদের নাম তালিকা বদ্ধ করা হল।

শ্রী বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (১৯৯৯)
শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য (২০০০ - ২০০১)
শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের শ্যালক (২০০২)
শ্রী নারায়ণ ভট্টাচার্য (২০০৩ - ২০১৬)
শ্রী দীপ চৌধুরী (২০১৭)
শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তী, শ্রী রাজদীপ রায় (২০১৮ - ২০১৯)
শ্রী মলিন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতি ঝুমা রায় (২০২০)
শ্রী রাজদীপ রায় ও শ্রী মলিন চট্টোপাধ্যায় (২০২১ - ২০২২)
শ্রী কুনাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রী মলিন চট্টোপাধ্যায় (২০২৩)

পূজাপদ্ধতি

চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা আগেই উল্লেখ হয়েছে যে, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণানুগৃহীত যজুর্বেদীয় মতে করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ইতিহাস অনুসরণ করে পূজার প্রচলন করা হলেও প্রাচীন যে তালপাতায় লেখা পুঁথি ছিল তা কুলপুরোহিত শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ গৌতম মহাশয়ের কাছেই থেকে যায়; ফলতঃ পূজা পদ্ধতির মূল অংশ, ভাণ্ডার এক থাকলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পণ্ডিতের প্রণীত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে অতীতে।
যেমন - শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় পণ্ডিত শ্রী রত্নেশ্বর তন্ত্রজ্যোতিষশাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত পদ্ধতি অবলম্বন করেন (১৯৯৯ - ২০১৪) । ২০১৫ সালে, শ্রী

দুর্গাপূজা পদ্ধতি

রবীন গৌতম ও পরেশ গৌতম মহাশয় তালপাতার প্রাচীন পুঁথি অনুসরণ করেন। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে, পণ্ডিত শ্রী শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রী বামদেব ভট্টাচার্যের পদ্ধতি অনুসৃত হয়। ২০১৮ সালে পণ্ডিত শ্রী অশোককুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত পদ্ধতি ও *ক্রিয়া-কাণ্ড-বারিধিঃ* পুস্তক অনুসৃত হয়। এত ঘন ঘন পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়ায় পূজা সম্পাদনে খুব অসুবিধা সৃষ্টি হতে থাকে, তাই ২০১৯ সালে সমস্ত প্রচলিত পূজা পদ্ধতি, ত্রিপুরাণোক্ত বিধি, *ক্রিয়া-কাণ্ড-বারিধিঃ*, *পুরোহিত দর্পণ*, তালপাতার পুঁথি এবং পণ্ডিত শ্রী শ্যামাচরণ কবিরত্নের বই পাঠ করে, রামকৃষ্ণ মঠের এক বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী (নাম উল্লেখে অসুবিধা আছে), শ্রী শ্রীমন্ত চক্রবর্তী মহাশয় ও শ্রী পরেশ চন্দ্র গৌতম মহাশয়ের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে শ্রী দীপ চৌধুরী সংকলন করেন পূজা পদ্ধতির প্রথম সংস্করণ। ২০১৯ – ২০২১ পর্যন্ত ওই প্রথম সংস্করণে পূজা হয়। পরবর্তীকালে ২০২২ সালে, ওই সন্ন্যাসী সহ আরও এক পণ্ডিত সন্ন্যাসীর পরামর্শে রচিত হয় দ্বিতীয় সংস্করণ। ২০২৩ সালেও ওই দ্বিতীয় সংস্করণেই পূজা সম্পাদিত করা হয়।

ঢাকি

ঢাক দুর্গাপূজার মূল একটি বাদ্য। মূখ্যতঃ রণবাদ্য হলেও ঢাক বাঙালি সমাজে পূজার বাদ্য হিসাবেই সমাদৃত। চৌধুরী পরিবারে আসা ঢাকিদের নাম নিচে আলোচনা করা হল। প্রথম বছর থেকে বর্ধমানের রায়না গ্রাম থেকে আসতেন ঢাকি, ঢুলি ও কাঁসর বাদক (১৯৯৯ – ২০০৮)। এই 'রায়নার ঢাকির' তালে তালেই নেচেছেন কতজন পরিবারের সদস্য; পরিবারের জামাই শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত মহাশয় কখনও বা ঢাক, কখনও বা ঢোল আবার কখনও বা ধুনাচি হাতে তুলে আনন্দ নৃত্য পরিবেশন করেছেন এবং অন্যকেও যেন তালে তালে নাচতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কখনও বা ঢাক বাজিয়েছে শ্রী সায়ক, কখনও বা শ্রী দীপ (যদিও সে অত্যন্ত ছোট তখন)। পরবর্তিতে ২০০৯ ও ২০১০ সালে বাঁকুড়া থেকে আসেন শ্রী রাজু দাস ও শ্রী পিন্টু দাস ঢাক ও ঢোল নিয়ে। ২০১১ ও ২০১২ সালে যথাক্রমে তারকেশ্বর ও বর্ধমান থেকে আসেন ঢাকি। ২০১৩ – ২০১৫ সালে আসেন শ্রী স্বপন দাস। ২০১৬

সালে বাঁকুড়া থেকে আসেন শ্রী পিড়ু দাস। ২০১৭ সালে একজন বৈদ্যবাটি থেকে আসেন। ২০১৮ – ২০১৯ সালে বাঁকুড়া থেকে আসেন শ্রী সুবল দাস। করোনা সংক্রমণ কমাতে ২০২০ – ২০২২ সালে কোন ঢাকি আসেন নি, পরিবারের তরফ থেকে একটি ঢাক শ্রীরামপুর থেকে কিনে এনে বাজানো হয়। ২০২৩ সালে আসেন কোন্নগরের ঢাকি শ্রী নূপুর দাস। সঙ্গে বাড়ির ঢাকে তালে তালে কখনও যোগ দেন শ্রী দীপ, শ্রী শুভদীপ অথবা শ্রী অভীক ভট্টাচার্য। জোড়া ঢাকের বাদ্যে বাড়ির পরিবেশ যেন মেতে ওঠে।

ঢাকের তাল দিতে ব্যস্ত পরিবার

প্রিয়তমাসু

মলিন তমাল চট্টোপাধ্যায়

বাঁধন ছেড়ে যাচ্ছি উড়ে একা ---
অজানা পথে হয়তো বা পাবো দেখা ,
জেনো, পৃথিবীটা আজও দেখা যায় গোল---
ভালোবাসা নিয়ে মিছে শুধু সোরগোল!
সূর্য ছড়ায় আধখানা ভোরে আলো,
আধখানা এই জীবন জুড়ে কালো,
কালোর কালিমা কালচে চোখে নেশা ---
আমার কালো রবির আলোয় মেশা।
দুরু দুরু বুকে, উড়ু উড়ু প্রাণ নিয়ে,
ভাঙা ডানায় ভর করে যাই উড়ে,
দেখলে না তুমি, ডাকলে না সেই নামে,
যে নাম ছিল তোমার হৃদয় জুড়ে।
রঙ্গমে আজও রক্তিম তাজা লাল,
তোমার হাতের ছোঁয়ায় জ্বালে আগুন ,
বুক জ্বলে আজও, মনের আগুন জ্বলে ---
গ্রীষ্মেও আজ হৃদয়ে নাচে ফাগুন।
ভালো থেকো তবু, ভালো থেকো ওগো প্রিয়ে,
ভালোবাসা থাক্, তোমাকেই শুধু নিয়ে ---
অন্তিম ক্ষণে, অন্তিম সুরে বেজে,
আমার কবিতা তোমাতেই থাক্ সেজে।

শিল্পী - সুদীপ্ত সরকার

পূজা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব

দীপ চৌধুরী

মন-তুলসী ভক্তি-চন্দন
যে জন তোমায় দিতে পারে,
শিলার পৃষ্ঠে কাষ্ঠের চন্দন
ঘষতে হয় না বারে বারে।
সাজি ভরা বন ফুলে
পূজা হয় না কোন কালে,
ফুলের পূজা সবাই করে
মধু লুটে নেয় মধুকরে।।

অর্থাৎ, ইষ্ট দেবতার শ্রীচরণে ভক্তি চন্দন মাখানো মন পুষ্প যে দেন তিনিই প্রকৃত পূজারী, সার্থক তাঁর আরাধনা। এখন প্রশ্ন হল 'পূজা' কি?

পূর্বজন্মানুশমনাজ্জন্মমৃত্যুনিবারণাৎ।
সম্পূর্ণফলদানাচ্চ পূজেতি কথিতা প্রিয়ে।।
- কুলার্ণবতন্ত্রম্

সেই ক্রিয়াকেই পূজা বলে প্রিয়, যে ক্রিয়া পূর্বজন্মকৃত কর্মপ্রবাহ শান্ত করে, জন্মমৃত্যু নিবারিত করে এবং ফল দান করে।

এবার আসা যাক ফলে, কোন ফল? – আম, জাম, কাঁঠাল নাকি অন্য কিছু? – না, এই ফল খেয়ে পেট ভরবে এমন সামান্য ফল নয়। এই মহাফল হল আত্মলয়ের, যেখানে গিয়ে মানুষ নিজের সত্ত্বাকে খুঁজে পায়। 'সুখ, দুঃখ সমান হল তাঁর আনন্দ সাগর উথলে'। অর্থাৎ শান্তির ফল। তাই এত ধুমধাম করে পূজার আয়োজন।

'শুদ্ধমনে শুদ্ধদেহে নিষ্ঠাভক্তি সহকারে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে বিবিধ উপচারে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমায় তাঁদের জীবন্ত উপস্থিতি কল্পনা করে পরমাত্মীয়জ্ঞানে আপ্যায়ন করাকে সাধারণ ভাবে পূজা বলা হয়।'

মহানির্বাণতন্ত্রের পরিভাষায় ব্রহ্ম সদ্ভাব উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তুতি-জপ অধম এবং বাহ্যপূজা অধমাধম, অধমেরও অধম। 'অধমাধম' কথাটি কিন্তু এখানে ইষ্টে পৌঁছুবার একটা অবলম্বন। পূজা

চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ চক্রবর্তী

দুই প্রকার – বাহ্য ও আন্তর। 'উভয়েরই মূল্য সমান'। এই বাহ্য ও মানসিক পূজা মিলিয়ে সম্পাদিত হয় পূজা।

পূজার সময় রজতাসনাদি ষোড়শোপচার থেকে শুরু করে সঘৃত (সাজ্য) বিল্বপত্রে আহূতি যেমন পূজা হয়, তেমনই পূজা হয় পূজারির ভক্তিতে, পূজারির নির্মল মানসপুষ্পপত্রাদিতে। এই অন্তরের পূজাই পূজাকালে পূজা পদ্ধতিতে মানসপূজা নামে পরিচিত।

পূজারি ধ্যানের পুষ্প নিজের মাথায় রেখে হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত ইষ্টদেবতাকে নানাবিধ মানসোপচারে পূজা করেন। যেমন – ফুলের বিবরণ গুলি –

অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈ
-রর্চ্চয়েদ্ভাবগোচরাম্।।
অমায়মনহঙ্কার-
মরাগমমদং তথা।।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষা
ক্ষোভকৌ তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ
দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ।।
অহিংসা পরমং পুষ্পং
পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং
জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্।।
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব-পুষ্পৈঃ
সংপূজয়েচ্ছিবাম্।

চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ চক্রবর্তী

পূজা পদ্ধতিতে প্রথমত বিঘ্ন অপসারনাদি অনেক রকম শুদ্ধি রয়েছে, এগুলি হলো – স্থান, আসন, নিজের করতল, পুষ্প, দেবতা, পূজাদ্রব্য, মন্ত্র, ভূত। এর মাধ্যমে পূজারি নিজের মনকেই প্রকৃতপক্ষে নির্মল করে তোলেন।

তবে, মা যে চিন্ময়ী! সবই তাঁর জ্ঞাত। তাহলে কেন এই মন্ত্রোচ্চারণ? কেনই বা এত শুদ্ধিক্রিয়া? তত্ত্বের দিক দিয়ে ভাবনা করলে, আমরা সকল জীব তাঁর স্ব স্ব সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কলুষতায় পূর্ণ। কিন্তু, দেবী? পরব্রহ্মস্বরূপা, অপারা, বিশ্ব সারা, বিশ্বাধারা হয়েও ভক্তের কাছে 'মা'। সন্তান যতই কাদা মাখুক না কেন, মা কি কোলে তুলে নেন না? তবু আমরা মায়ের কাছে শুদ্ধভাবে, শুদ্ধমনে প্রার্থনা করি। তাই এত শুদ্ধি। উল্লেখ্য, এর মধ্যদিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে সকল জননী কিংবা নারীর কাছে সকল মানুষের কত পবিত্র ও শুদ্ধ মনে আচরণ করা উচিত।

পরবর্তী ক্রমে দেখা যায়, ভূতশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের দেহের মলিনতা ও দেহত্ববোধকে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক, দগ্ধ ও ধৌত করে নবরচিত দিব্যদেহ রচনা করা হয়। তাতে ইষ্টদেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন পূজারি। ন্যাস (কোন বিশেষ মন্ত্র সহ বিশেষ স্থান স্পর্শ) করা হয় পূজায়, ওর উদ্দেশ্য জীবদেহে আজ্ঞা (দ্বিদল), বিশুদ্ধ (ষোড়শদল), অনাহত (দ্বাদশদল), মণিপুর (দশদল), স্বাধিষ্ঠান (ষড়্দল), মূলাধার (চতুর্দল) চক্রে ক্রমে ক্রমে বর্ণমালার বীজ যোগে ন্যাস করে, সেগুলিকে চিন্ময় কল্পনা করা হয়। এর অর্থ দেবতা হয়ে দেবতার পূজা, 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', তাই নিজের দেহেই দেবতার অঙ্গুলি ও দেবতার অঙ্গজ্ঞানে স্পর্শ করেন পূজারি।

পূজা পদ্ধতি একটু দেখলে বোঝা যায় যে পূজ্য দেবতা বাইরের কেউ নন, তিনি আত্মস্বরূপ। প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি

সম্পাদনের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে আহৃত বস্তু (যথা – মাটি, জল, খড়, বাঁশ, পাট ইত্যাদি) দিয়ে নির্মিত প্রতিমাতে আপন চৈতন্যকেই প্রতিষ্ঠা করেন পূজারি। আবার পূজার শেষে সেই প্রাণশক্তিকে আঘ্রাণের মাধ্যমে স্বহৃদয়ে পুনর্স্থাপন করেন।

তাহলে একটা প্রশ্ন আসে, ভিতরের দেবতাকে বাইরে টেনে এনে পূজা করে আবার ভিতরে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্য ঠিক কি? হ্যাঁ, উদ্দেশ্য একটাই কর্মের বাসনা নাশ করা। আমরা সকল জীব প্রাকৃতিক (তন্ত্রের ভাষায় - পূর্বজন্মকৃত সংস্কারের) কারণেই একাধিক কর্মবাসনার বন্ধনে আবদ্ধ। এর থেকে মুক্তিই আমাদের সকল জীবের একটি মাত্র উদ্দেশ্য। কর্মবাসনা ত্যাগ করার জন্যই কর্ম করতে হবে। শুভ কর্ম মঙ্গল বিধান করে, অশুভ কর্ম অমঙ্গলের বিধাতা। তাই পূজা এক শুভ কর্ম। এর মাধ্যমে মানুষ তাঁর আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়। এই আত্মোপলব্ধিই পূজার 'ফল'। এর মাধ্যমে মানুষ তাঁর স্বরূপকে জানতে পারে এবং অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন হয়, জগতের মঙ্গল করে।

পূজা ছাড়াও কিন্তু একাধিক ভাবে কোন ব্যক্তি এই আত্মোপলব্ধি করতে পারেন। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে জগতের হিতসাধন করে, দরিদ্রে দান, ক্ষুধার্তে অন্নদানের মাধ্যমেও মানুষ নিজ স্বরূপ 'দেবতা'য় উপনীত হন। এভাবেই অসংখ্য সমাজসেবী, শিক্ষক, চিকিৎসক সমস্ত মহৎ ব্যক্তি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন যুগে যুগে, কালে কালে এই সোনার দেশ ভারতবর্ষে।

আসুন না, আমরা সকলে মানুষকে ভালোবেসে নিজের পরমার্থিক কল্যাণ সাধন করি, নিজেকে ধন্য করি। দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা ত্যাগ করে পরমানন্দে 'জীবে প্রেম' করি।

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু,
সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ,
কর সখে, এ সবার পায়ে।।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।।

শিল্পী - সুমন ভট্টাচার্য্য

পুজোর স্মৃতি

অভিষেক কুন্ডু

পুজোর ক'টা দিন কাটলো ভালো,
দশমীতে সব বন্ধ আলো,
সিঁদুর খেলা আর ধুনুচি নাচ,
ঝাড়বাতিটার শৌখিন কাঁচ,
রাতদিন আনন্দে মেতে
হাতের উপর হাতটি রেখে,
দেখতে থাকে শুধুই তাকে
দু'জন দুজনাকে,
উৎসবের ওই দিনগুলো
এক পলকেই চলে গেলো।
বাড়লো বোঝা মনের একি,
ভালোবাসা- প্রেম সব ফাঁকি!
আপনজনদের সাথে কয়দিন
অজান্তেই সময় হয়ে গেল ক্ষীণ;
পুরনো বন্ধুদের মিলন হওয়া —
দিনভর সেই আড্ডা দেওয়া —
রাত পোহাতেই হল উধাও,
রঙিন শহর আর বাজনা বাজাও।
পড়তে বসা আর নয়কো সোজা,
মগজ দিচ্ছে স্মৃতির খোঁচা!
চোখ যদিও বইয়ের ওপর,
তরুণ মনে তাই করি কদর।
সারা বছর, ভালো রেখো।
আসছে বছর, মা, আবার এসো।

ছবি ওয়ালার
পাতা

চিত্রগ্রহণে - সৃষ্টি বসু

চিত্রগ্রহণে - শ্রদ্ধা মুখার্জী

চিত্রগ্রহণে - সৃজা চৌধুরী

শিল্পী - মিয়াঙ্ক চক্রবর্তী

শিল্পী - সুদীপ্ত সরকার

চিত্রগ্রহণে - সৃজা চৌধুরী
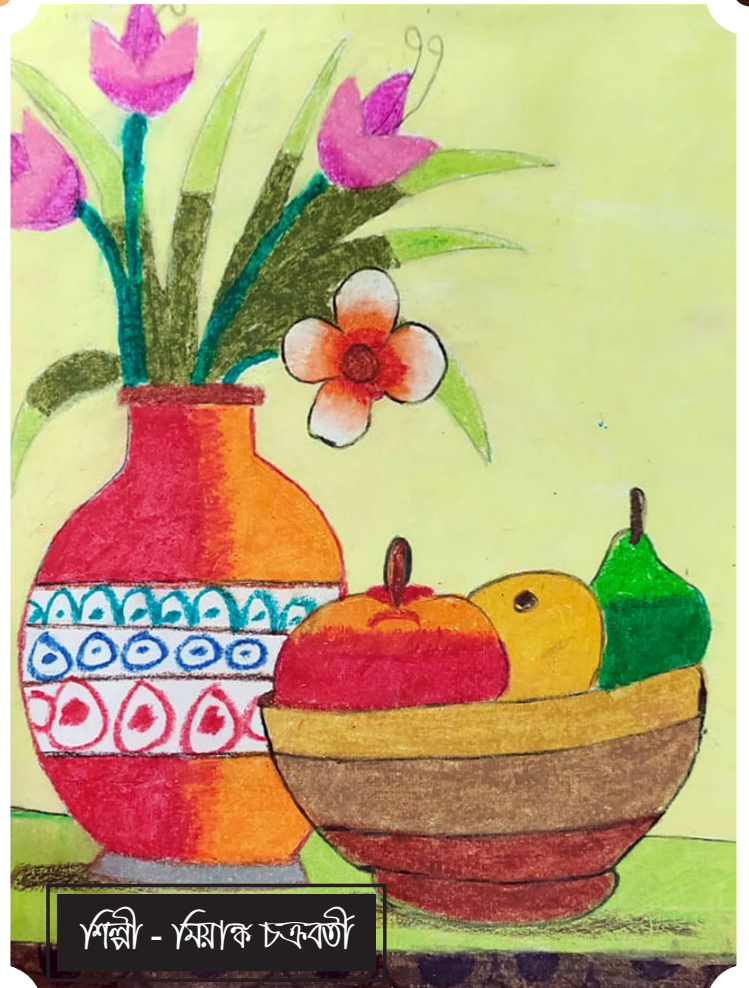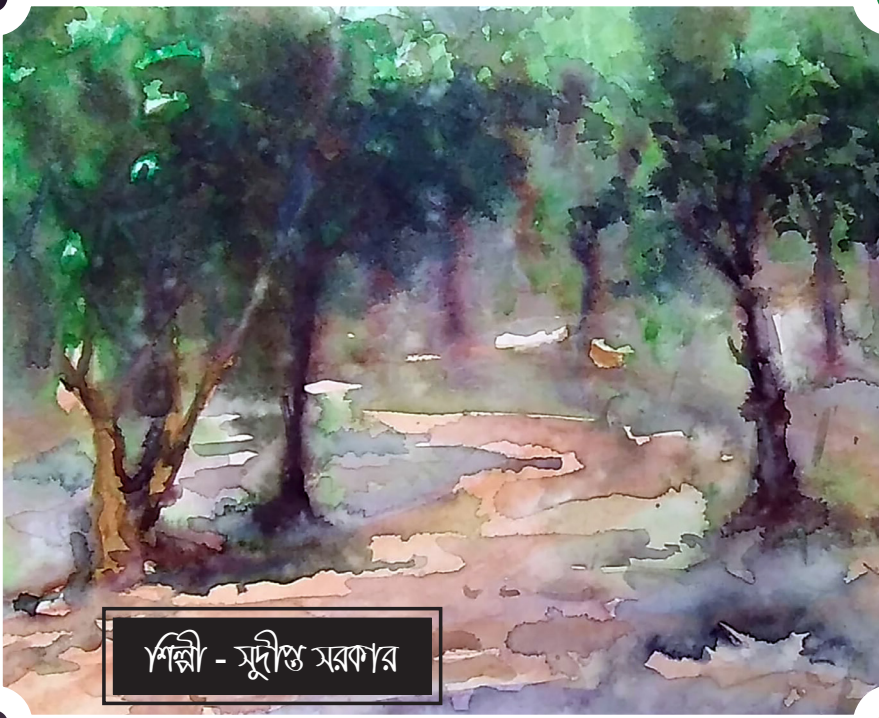
শিল্পী - সুমন ভট্টাচার্য্য
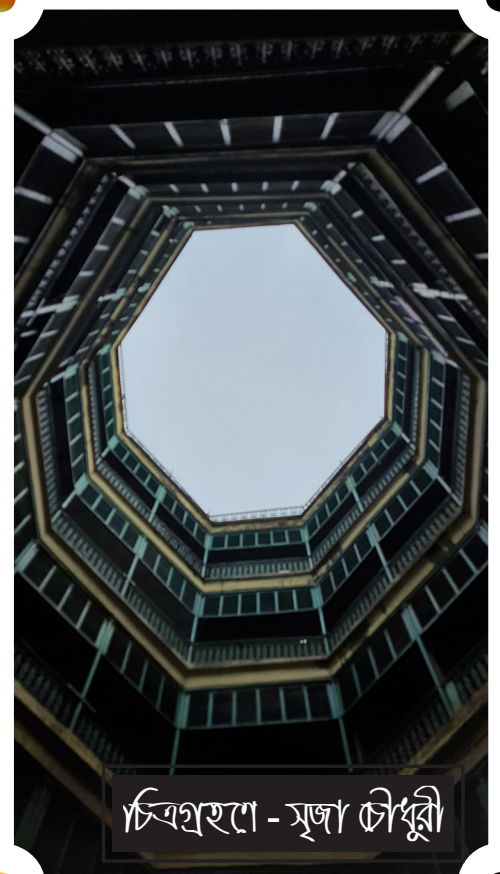
চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ চক্রবর্তী

শিল্পী - দেবার্পা লাহা
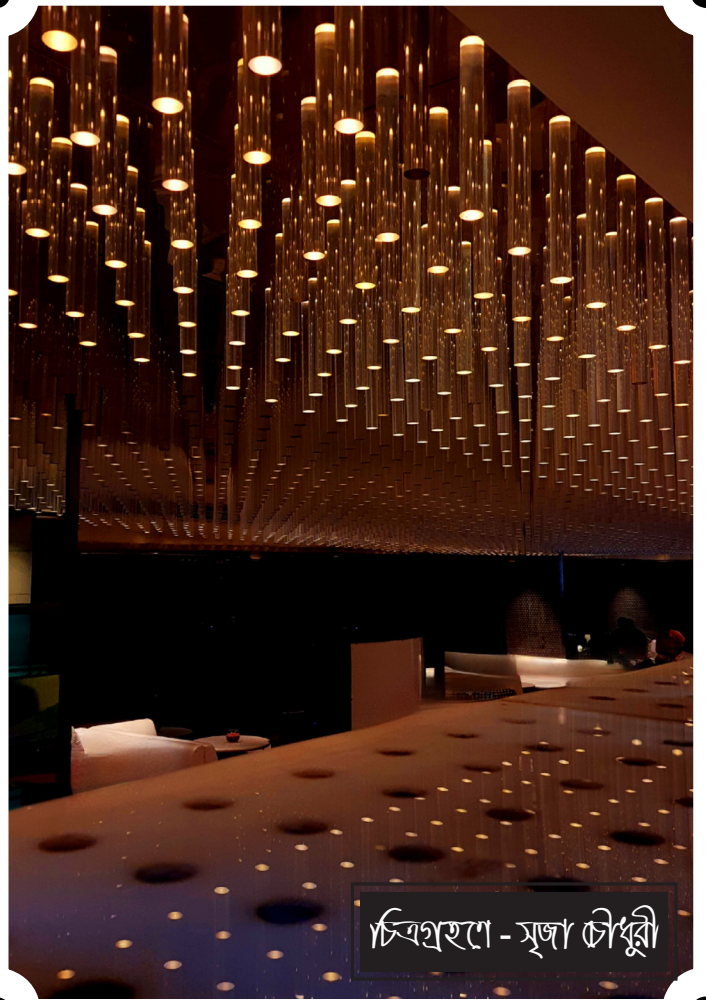
চিত্রগ্রহণে - সৃজা চৌধুরী

শিল্পী - সুমন ভট্টাচার্য্য

চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ ও অঙ্কুশ

শিল্পী - রিতীকা দত্ত

চিত্রগ্রহণে - অঙ্কুশ দাস

শিল্পী - রিয়াঙ্কা সিনহা

চিত্রগ্রহণে - অর্পিতা দে

চিত্রগ্রহণে - মোহর ব্যানার্জি

শিল্পী - সাগরিকা সিংহ

Sagarika's Artworks

চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ চক্রবর্তী

চিত্রগ্রহণে - সৃজা চৌধুরী

চিত্রগ্রহণে - সম্পূর্ণা কুন্ডু

চিত্রগ্রহণে - সম্পূর্ণা কুন্ডু

শিল্পী - রিয়াঙ্কা সিনহা

চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ চক্রবর্তী

শিল্পী - সুমন ভট্টাচার্য্য

চিত্রগ্রহণে - সৃজা চৌধুরী

চিত্রগ্রহণে - সম্পূর্ণা কুন্ডু

চিত্রগ্রহণে - সৃজা চৌধুরী

কর্ম্মবীর

দীপ চৌধুরী

হে চন্দ্রচূড়, নীলকণ্ঠ, কোথায় তুমি, আজ?
মহাকাল, বাজাও তুমি কর্মের দুন্দুভি নাদ!
হাহা, হুহু মহারবে ভুলাও তুমি পাপ-লাজ।
জীবনে তুমি জীবন দাও, মোচন কর আর্তের নাদ।
বহুজন আজ ক্ষুধায় মরে, নেই যে কোন কর্ম-কাজ।
নব জীবনের মন্ত্র দিয়ে খণ্ডন করো আলস্য ফাঁদ!

এই ধরা আজ অলসে ভরা যেন প্রায় সকলই জড়
কি বিষম বিষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ছে দেখ চরাচর।
তোমায়, প্রভু, দোহাই এবার অলসতা করো নাশ
মানুষকে মনে দাও সাহস, ছিন্ন কর জড় পাশ।
রঙিন ফুলে বরিলে তুমি বসন্তকে পঞ্চম সুরে-
ইস্কুলে যাক সব বাসন্তীরা বাধা-ব্যবধান ছুঁড়ে।

দাও, হে নটরাজ প্রভু, 'মাভৈঃ' রব মাত্র -
নমি তোমায় কর্মবীর, নমি দিবা-রাত্র।।

শিল্পী - মোহর ব্যানার্জি

শৌভিক চট্টোপাধ্যায়

মেঘের ভেলাগুলি ভাসছে নীলাকাশে,
নদীর দুইকূল ভরেছে কাশে কাশে,
বাতাসে পুজোপুজো গন্ধ ভেসে আসে,
সেবারে ছিলি তুই এবারে নেই পাশে।

সেবারও আশ্বিনে মধুর হাসি হেসে,
শিউলি-ঝরা পথে, কি অপূর্ব বেশে,
হঠাৎই এসেছিলি দশমীপুজো শেষে,
হারিয়ে গেলি কোন্ অজানা দূরদেশে।।

পুজোর কটা দিন গ্রামের প্যান্ডেলে
ঠাকুর দেখা ঘুরে অন্য কাজ ফেলে।
কখনও হেঁটে হেঁটে কখনও সাইকেলে
দুপাশে ধানক্ষেত, চলেছি টর্চ জ্বেলে।

ডুলুং নদী তীরে জোনাক-জ্বলা রাতে
ভেসেছে চরাচর চাঁদের জোছনাতে
কিছুই নয় তবু, কত-না মায়া তাতে!
হবে না দেখা আর কখনও তোর সাথে?

শিল্পী - নিবেদিতা শীল

চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা পায়ে পায়ে পঁচিশে

একটি প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোন্নগর শহরের ২৪ পল্লীর চৌধুরী পরিবার ১৯৯৯ সালে যে শারদীয়া দুর্গোৎসবের সূচনা করেন তা এই বছর ২০২৩ সালে ২৫ তম বর্ষ উদ্‌যাপন করল। ষষ্ঠী তিথিতে ২০শে অক্টোবর কল্পারম্ভের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পূজা। পূজায় উপস্থিত ছিলেন আত্মীয়-পরিজন সহ পরিবারের ছয় সদস্য। শ্রী প্রদীপ কুমার চৌধুরী পরিবারের কর্তা হিসেবে বরণ করেন সাক্ষী নারায়ণ শিলাকে।
এই বছর দেবীকে ডাকের সাজে সুসজ্জিতা করেন পঁচিশ বছর ধরে যিনি প্রতিমা করছেন শিল্পী শ্রী বিশ্বজিৎ পাল। নূতন ঝাড়বাতি লাগানো, আলপনায় ভূষিত দুর্গা মণ্ডপে দেবীর সেবা করেন পূজক শ্রী দীপ চৌধুরী, তন্ত্রধারকত্ব ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করেন শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তী। পূজায় শ্রীশ্রী দুর্গাভাণ্ডারের দায়িত্ব নেন শ্রী কুনাল চক্রবর্ত্তী এবং শ্রী মলিন চট্টোপাধ্যায়। ঢাক পরিবেশন করেন শ্রী নূপুর দাস এবং অন্যান্যরা।
পূজার নির্দিষ্ট নিয়ম মতো নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সমস্ত পূজা সম্পাদিত হয়। পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রীমতি রিনা পাণ্ডে মহাশয়া। পূজা অনুষ্ঠানে যোগ দেন স্থানীয় মানুষজনেরাও। প্রতিদিন পূজার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যারতির পর দেবীর প্রীতি বিধানের জন্য চলতে থাকে আগমনী সঙ্গীত, কালী কীর্তন, মাতৃ সঙ্গীত সহ অন্যান্য গান। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিক মহারাজ, দাশরথি রায়, রাধিকাপ্রসন্ন প্রমুখের গানে দেবীকে প্রীত করা হয়। শ্রীশ্রী দুর্গা ভাণ্ডার থেকে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণ করা হয় হাতে হাতে। অন্যদিকে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে প্রসাদ গ্রহণ করেন সব মিলিয়ে প্রায় চারশো জনের বেশি মানুষ। সকলকে রান্না রেঁধে পরিবেশন করার দায়িত্ব নেন সর্বশ্রীমতি নীলিমা সাউ, সুমিত্রা মণ্ডল।
পূজা চলাকালীন পূজা দেখতে আসেন বিশেষ গুণীজনরা। উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষক শ্রী শোভন চক্রবর্তী, ডঃ শ্রী অসিত কুমার পাত্র, শ্রী সব্যসাচী কোনার মহাশয়ের মতো স্বনামধন্য মানুষও আবার উপস্থিত ছিলেন ডঃ শ্রী বিশ্বদীপ দাস, ডঃ শ্রী গৌতম গুপ্তের মতো চিকিৎসকরাও।
২২শে অক্টোবর অষ্টমী পূজা সমাপ্ত করে অপরাহ্ণ ৪:৫৪ থেকে সন্ধ্যা ৫:৪২ পর্যন্ত সন্ধিক্ষণে দেবী চামুণ্ডার পূজা করা হয়। নবমীর দিন পূর্ণাহুতি ও দক্ষিণার মাধ্যমে সমাপ্ত হয় মূল পূজানুষ্ঠান। দশমীর দিন (২৪ শে অক্টোবর) দর্পণে দেবীর বিসর্জন দিয়ে রাত্রি ৮ঃ৪৫ নাগাদ দেবীর প্রতিমা পঞ্চু দত্ত ঘাটে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। এসে শান্তিপাঠ করে শান্তিবারি সিঞ্চন করা হয়।
প্রথা মেনে একাদশীর দিন শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পূজা করেন পূজক শ্রী মানিক চন্দ্র চক্রবর্তী।
২৭ শে অক্টোবর বিজয়া সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় চৌধুরী পরিবারের ২৫ তম শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

চৌধুরী পরিবারের

২৫ তম

দুর্গা পূজা - ২০২৩

শ্রী শ্রী দুর্গা মহাপূজা - ২০২৩
চৌধুরী পরিবার
২৫তম বর্ষ

শ্রী শ্রী দুর্গা মহাপূজা - ২০২৩
চৌধুরী পরিবার
২৫তম বর্ষ
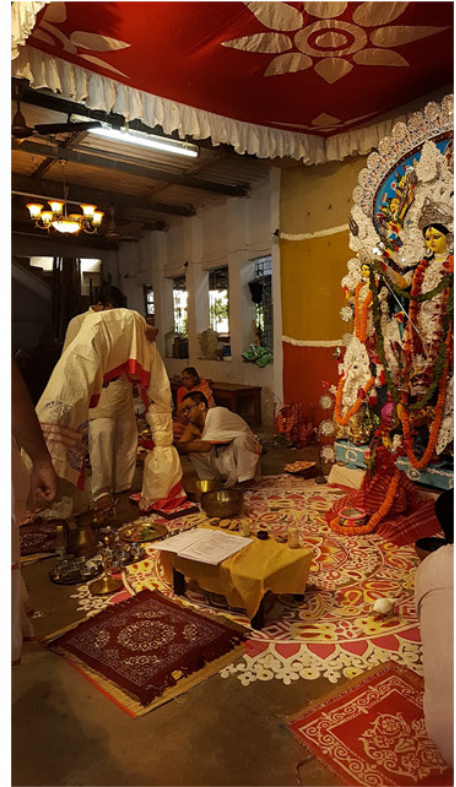
ঠাকুর বাড়ির বিজ্ঞানচর্চা

কুনাল চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের ছিল দুই বাড়ি। একটি হল উপনিষদ এবং অন্যটি বিজ্ঞান। এই দুই বাড়ির মধ্যে নেই কোন ভেদাভেদ, নেই কোন ভুল বোঝাবুঝি, নেই কোন বিবাদ। রয়েছে এক অপরূপ সুন্দর মেলবন্ধন। রবীন্দ্রনাথের কথায় সহজেই ফুটে উঠে এই বাস্তব সত্য -

*"যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা,
নিত্য বর্ণ, গন্ধ, শীত করিছে রচনা।"*

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বিজ্ঞান ও উপনিষদের উন্মোচন ঘটেছিল বালক বয়সে এবং তা ঘটেছিল তাঁরই পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। তাঁর দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায় মিশে গিয়েছিল উপনিষদের ধ্যানলব্ধ সত্য ও বিজ্ঞানের প্রমানলব্ধ সত্য। এবং চেতনায় ফুটে উঠেছিল এক বিজ্ঞান ও উপনিষদের মেলবন্ধনের নবজাগরণ। ঠিক কি ঘটেছিল তা জানা যায় রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা থেকেই - "বয়স তখন হয়তো বারো হবে ... পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছুতাম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরি শৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন।"

এবার প্রশ্ন হল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বলা এই কথাগুলি বালক রবীন্দ্রনাথের মনে বিজ্ঞানবোধ কিভাবে জাগ্রত করেছিল? বালক রবির মনে হয়েছিল তাঁর পিতার দেখানো ওই গ্রহগুলির মধ্যে হয়তো বাস করে নানা জাতের প্রাণী।
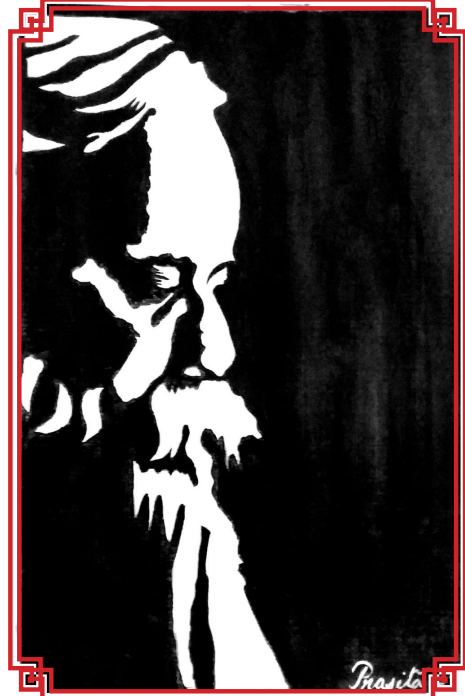
শিল্পী - প্রসিতা মজুমদার

সেই ধারণা থেকেই তিনি লিখে ফেলেছিলেন একটি প্রবন্ধ "গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি"। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায়। এটিই ছিল তাঁর প্রকাশিত প্রথম গদ্যরচনা। সাল ১৯৩৭, তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর। সেই তেষট্টি বছর বয়সে তিনি লিখে ফেললেন একটি গ্রন্থ যার নাম "*বিশ্বপরিচয়*"। এইটি তাঁর লেখা একমাত্র বিজ্ঞানের বই যা তিনি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

বিশ্বপরিচয় থেকেই বোঝা যায় যে তিনি ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার। *বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কথা বলেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তাঁর তৈরি বিদ্যালয় পাঠভবন ও বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে রচনা করেছিলেন বিজ্ঞানচর্চার সুপরিবেশ। বিজ্ঞানের সূত্রেই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর। বলা বাহুল্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিদেশে গিয়ে গবেষণার পিছনে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁর এই বিজ্ঞানপ্রেম ও বিজ্ঞানমনস্কতা পেয়েছিলেন পারিবারিক সূত্রে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি এক গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের। তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহ ছাড়া কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা ও কলকাতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার সম্ভব ছিল না। সেই সময় গোঁড়া হিন্দু পরিবার থেকে যে সমস্ত ছাত্র ডাক্তারি পড়তে আসত, তাদের মধ্যে অনেকেই শবদেহ কাটাছেঁড়া করতে চাইতো না। তাদের আপত্তির পিছনে ছিল এই ভাবনা - 'উচ্চবর্ণের হিন্দু মরা কাটবে! তাতে জাত যাবে, পাপ হবে এবং সেই পাপে নরকবাস নিশ্চিত।' তাই মরা কাটার ভয়ে ডাক্তারি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তৎকালীন গোঁড়া পরিবারগুলি। তখনই দ্বারকানাথ ঠাকুর এক বুদ্ধি বার করলেন। বাৎসরিক দুই হাজার টাকার অনুদান বৃত্তি ঘোষণা করলেন। তখন এটা অনেক টাকা! ফলে গোঁড়া হিন্দুছাত্রদের সংস্কার মুক্তি ঘটল। শবদেহ কাটাছেঁড়ার ব্যাপারে আর কোন আপত্তি রইল না। ঠাকুরবাড়ির বিজ্ঞানচর্চার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার বীজ রোপণ হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতেই।

এবার আসা যাক তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাপারে। পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন তাঁর "*জীবনস্মৃতি*" গ্রন্থে - "গত মাসের ও গত বৎসরের তুলনা করিয়া সমস্ত আয়-ব্যয়ের বিবরণ তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া হইত। প্রথমত মোটা অঙ্কগুলো তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে তাহার যোগবিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোন অসঙ্গতি অনুভব করিতেন তবে ছোট ছোট অঙ্কগুলো শুনাইয়া যাইতে হইত। কোন কোন একদিন ঘটিয়াছে, হিসাবে যেখানে দুর্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্য চাপিয়া গিয়াছি কিন্তু কখনো তাহা চাপা থাকে না। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্রপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেখানেই তিনি ধরিতে পাড়িতেন।

এত বড় জমিদারির শাখা প্রশাখায় বিন্যস্ত সুবিশাল হিসাব চিত্রপটে আঁকা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এখান থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে দুটো জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায়; এক - তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং দুই - অঙ্কে তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার।

ঠাকুর বাড়ির বিজ্ঞানচর্চা ছিল অনেকটা রূপকথার মতো। এই রূপকথার রাজকন্যা হিসাবে যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন'দিদি। দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাসুন্দরীর নবম সন্তান। রবীন্দ্রনাথের থেকে পাঁচ বছরের বড় স্বর্ণকুমারীর জন্ম ১৮৫৫ সালের ২৮শে অগস্ট। সে কালে মেয়েরা ছিল নিরক্ষর এবং বলাবাহুল্য সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর বিজ্ঞানচর্চা ছিল রূপকথার গল্পের থেকে কম কিছু

নয়। পিতা দেবেন্দ্রনাথই স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানচর্চার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। মূলত তিনি হতে চেয়েছিলেন সাহিত্যিক। কুড়ি বছর বয়সে লিখে ফেললেন "*দীপনির্বাণ*" নামের একটি উপন্যাস। তাঁর বিয়ে হয়েছিল এগারো বছর বয়সে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে বিয়ে হয়ে গেলেও তিনি কোনদিন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দেন নি। ১৮৮২ সালে ২৬ বছর বয়সে তিনি লিখে ফেললেন এক আশ্চর্য বিজ্ঞানের বই যার নাম "*পৃথিবী*" পৃথিবীর জন্ম, সূর্য ও সৌরপরিবার নিয়ে আলোচনা রয়েছে এই বইতে।

এবার আসি রবীন্দ্রনাথের নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়। সাহিত্য ও সুরচর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চা করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেকালে বঙ্গ নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞানচর্চার আমরা পরিচয় পাই মূলত *ভারতী* ও *সাধনা* পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গণিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতিতে বেশ কয়েকটি অক্ষগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। "*জ্যামিতির নতুন সংস্করণ*" তাঁর লেখা অন্যতম বিখ্যাত প্রবন্ধ।

এত সকল কিছু থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানচেতনা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তার সুগভীর শিকড় চলে গেছে তাঁর পারিবারিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন অন্ধকারের দরজা খুলে আলোক দেখাতে পারে কেবল বিজ্ঞানই। যতই তাঁর বয়স বেড়েছে ততই ঘন হয়েছে তাঁর এই চেতনা বোধ।

মন প্রাণ যেন সেই অন্ধকারের দরজা খুলে আলোর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে -

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়।
তিমিরবিদায় উদার অভ্যুদয়
তোমারই হউক জয়।"

চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ চক্রবর্তী

আমি ঈশ্বর

অঙ্কুশ দাস

আমি আদি, আমিই অন্ত
আমিই পরম জ্ঞান,
আমি ত্রিভঙ্গ ত্রিপুরা,
আমিই শৈব ধ্যান।

আমি জন্ম, আমি মৃত্যু,
আমি পরমের শেষ অংশ,
আমি সমুখ সমরে অপরাজেয়,
আমি করেছি পৃথিবী ধ্বংস।

তোমার মাঝে আমাকে দেখো
তাকাও ধরাধামে,
দশমের শেষ অংক আমি,
মহাবিদ্যার নামে।

আমি কাল, আমি অতীত
আমি পুরাতন আদি সত্য,
আমি আল্লাহ-মুসা-নানক-কৃষ্ণ,
আমি বিশ্বের মূল তত্ত্ব।

আমি রুদ্র, আমি তেজ,
আমি মায়ের স্নিগ্ধতা,
আমি মানব ভূমিতে দৈব সত্ত্বা,
আমি শান্তির শেষ চিতা।

পাথরের চেয়েও কঠিন আমি,
পাহাড়ের মত কঠোর,
সুধার রসে পূর্ণ আমি,
জননীর অমৃত-জঠর।

ফেরার রাস্তা বন্ধ আমার
হাতে ধরে মৃত খুলি,
দধীচির মত দৃঢ় হয়ে আজ,
প্রণয়ের কথা বলি,
আমি প্রলয়ের পথে চলি,
খামে মোরা এই পৃথিবীর বুকে
আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

অনলের মতো উগ্র আমি
প্রকৃতিকে করি গ্রাস
মুখোশের পরে,
আমি তোমাদেরই মতো
ফেলেছি, নিশ্বাস।

আমি আকাশের মত বিশাল,
আমি মনেতে অধিষ্ঠিত,
কৈলাস হতে বৈকুণ্ঠ
আমি বুদ্ধের মত স্থিত।

আমি সময়ের শেষে দাঁড়িয়ে একা
ধ্রুপদে তুলেছি সুর,
আগুনের খিদে মেটানোর তরে,
আমি গিয়েছি বহুদূর।

তোমার ভেতরে আমার নিবাস
আমার ভেতরে তুমি,
আমি তোমাতে মিশেছি যুগান্তরে
নব সৃষ্টির দেব ভূমি।

তোমাকে যুক্তির থেকে মুক্তির পথে
আজও নিয়ে যেতে চাই,
অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে গিয়ে
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর হয়ে যাই,
আমি ঈশ্বর হয়ে যাই।

শিল্পী - মধুপর্ণী চ্যাটার্জী

মেঘ

শ্রীতমা ভট্টাচার্য

মেঘ তুই যাবি মেঘ
সেই যে নদীর পারে
ওই মেয়েটি তখন থেকে
ডাকছে যে তোরে
তুই কেন এত অপেক্ষা করাস তারে
মেঘ তুই যা সেখানে
সে যে বড়ই আনন্দ পাবে
মনে মনে
মেঘ জমিয়ে না গেলে সেখানে
কেমন করে হবে বৃষ্টি
কেমন করেই বা হবে
ঠান্ডার সৃষ্টি।

চিত্রগ্রহণে - শুভদীপ চক্রবর্তী

পুরীর জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য

সৃষ্টি বসু

বাঙ্গালীদের ঘুরতে যাবার জায়গা মানেই 'দীপুদা', মানে দীঘা, পুরী আর দার্জিলিং। তার মধ্যে পুরীতে কিন্তু প্রায় সকলেরই বেশ কয়েকবার ঘোরা হয়ে গেছে। অল্প কিছুদিনের ছুটি পেলেই আমরা একটুও না ভেবেই যেখানে চলে যাই তা হচ্ছে পুরী। পুরীতে গিয়ে নীলাচলের সমুদ্রে স্নান করার পাশাপাশি আরও যে কাজটা আবশ্যক তা হল পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়া আর মহাভোগ বা মহাপ্রসাদের স্বাদ গ্রহণ করা। এসবই তো ঠিক আছে। একাধিকবার পুরী যাওয়া, ঘোরা, আনন্দ করার পাশাপাশি আপনারা কি পুরীর মন্দিরের রহস্যের কথা কখনো জেনেছেন? পুরীর এই জগন্নাথ মন্দির, যেমনই সুন্দর তেমনই রহস্যজনকও বটে। প্রাচীন পুরাণ অনুসারে এই মন্দির নাগরা শিল্প শৈলী অনুসরণ করে তৈরি করেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। মহাভারতের যুদ্ধের ৩৬ বছর পর শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটলে তাঁকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের দ্বারকা নগরীতেই দাহ করা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহ আগুনে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয় না। তাঁর হৃদয়টি তখনও সচল থাকে। সেই সময়ে দুঃখে শ্রীকৃষ্ণের অর্ধদাহ দেহ নিয়ে শ্রী বলরাম সমুদ্রের জলেই নিজেকে সলিল সমাধিস্থ করেন। তাঁকে অনুসরণ করেন ভগিনী সুভদ্রা। জলে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়টি পরা মাত্রই সেটি কাঠে পরিণত হয় এবং সমুদ্রের স্রোতে ভেসে যায়।

সেই একই সময়ে পুরীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্ন পান যে ভগবানের দেহ ভেসে উঠবে ভারতের পূর্ব উপকূলের এই পুরীর তীরেই। রাজাকে স্বপ্নাদেশে বলা হয় যে তিনি যেনো ভগবানের অস্থি উদ্ধার করে পুরীতেই কাঠের বিশাল কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে কৃষ্ণের কাঠের মূর্তির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়। রাজার এই স্বপ্ন সত্যি হয়। তিনি পুরীর পবিত্র সমুদ্রের জলেই খুঁজে পান শ্রীকৃষ্ণের অস্থি। কিন্তু তারপরেই রাজা যে সমস্যার মুখোমুখি হন তা হল ভগবানের এই ৩ মূর্তি তৈরি করবে কে? শোনা যায় যে ঠিক এই সময়েই সেখানে আবির্ভাব হয় বৃদ্ধাবেশে ভগবান বিশ্বকর্মার। বৃদ্ধ রাজাকে জানান যে এই মূর্তি তৈরির সময় কেউ যেনো তাঁকে বিরক্ত না করে। মূর্তি তৈরির ঘরে কেউ প্রবেশ করলে তিনি সেই মুহূর্তেই মূর্তি অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাবেন। এরপরে কেটে যায় কয়েক মাস। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আর ধৈর্য না রাখতে পেরে খুলে ফেলেন বিশ্বকর্মার ঘরের দরজা। সতর্কতা অনুযায়ী সেই মুহূর্তেই মূর্তি তৈরির কাজ অসমাপ্ত রেখে অদৃশ্য হয়ে যান ভগবান বিশ্বকর্মা। এই অসমাপ্ত মূর্তিতেই রাজা প্রাণ
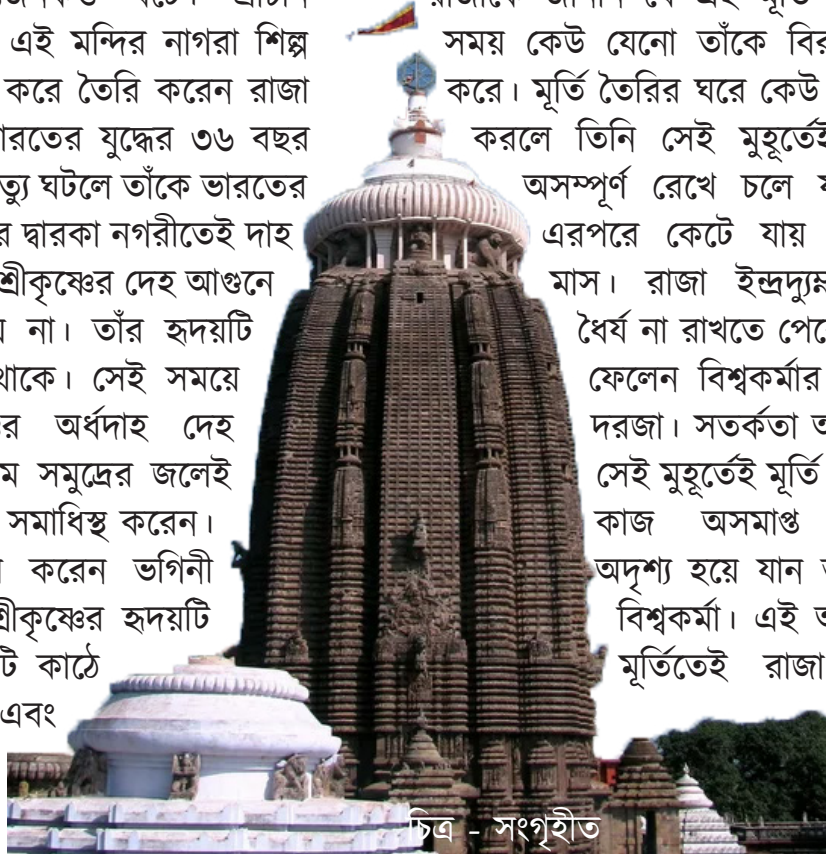
চিত্র - সংগৃহীত

প্রতিষ্ঠা করেন এবং মূর্তির ফাঁপা স্থানেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়। কথায় আছে যে যদি কেউ এই ব্রহ্ম নিজের চোখে দেখে ফেলে তবে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অনিবার্য। আজও প্রত্যেক বারো বছরে একবার করে পুরীর শ্রী জগন্নাথ দেবের কাঠের মূর্তি পরিবর্তন করা হয়। এটি শেষবার পরিবর্তন করা হয়েছিল ২০১৫ সালে। ব্রহ্ম স্থাপনের সময় পুরো উড়িষ্যার সমস্ত ইলেক্ট্রিকের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের পাণ্ডাদের চোখ। ব্রহ্ম স্থাপনের সময় যাঁরা এটি অনুভব করেছিলেন তাঁরা বলেছেন যে এটি অনেকটা খরগোশের মতই নরম তুলতুলে। কিন্তু এটি আসলে কি তা আজও কেউ জানে না। এ ছাড়াও লক্ষ্য করলেই পুরীর মন্দিরের ওপরে লাগানো পতাকাটি হওয়ার বিপরীত দিকে উড়তে দেখা যায়। এই ঘটনার কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও অনেক জনশ্রুতি কিন্তু প্রচলিত আছে। একবার পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে এসেছিলেন নারদ মুনি। সেই সময় মন্দিরের দরজায় পাহারায় ছিলেন স্বয়ং বজরংবলী হনুমান। নারদ মুনি মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি দেখেন যে ভগবান মন খারাপ করে বসে আছেন। নারদ মুনি এর কারণ জানতে চাইলে জগন্নাথ দেব জানান যে সমুদ্রের ভয়ানক আওয়াজে তাঁরা ৩ ভাই বোন শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারেন না। এই কথা হনুমানজির কানে যাওয়া মাত্রই তিনি সমুদ্রের কাছে যান এবং সমুদ্রকে তার গর্জন বন্ধ করতে বলেন। সমুদ্র জানান যে হনুমানজির পিতা পবন দেবের হওয়ার কারণেই সমুদ্রের গর্জন কখনো থামে না। হনুমানজি তাঁর পিতার কাছে গিয়ে হাওয়া বন্ধ করতে বললে পবনদেব জানান যে হাওয়া বন্ধ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তখনই হনুমানজি পুরীর মন্দিরের চারপাশে হাওয়ার থেকেও দ্রুতবেগে হাওয়ার বিপরীত দিকে

শিল্পী - মোহর ব্যানার্জি

একটি চক্র লাগান যার ফলে মন্দিরের উপরের পতাকাটি বায়ুর বিপরীতে উড়তে শুরু করে আর মন্দিরের ভিতর সমুদ্রের গর্জন প্রবেশ করাও বন্ধ হয়ে যায়। সেই দিন থেকে নাকি আজ পর্যন্ত সবসময় পুরীর মন্দিরের এই পতাকা হাওয়ার বিপরীতেই উড়তে থাকে। এই পতাকাটি প্রতিদিন ভোরবেলায় মন্দিরের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয় আর সন্ধ্যেবেলায় খুলে নেওয়া হয়। এমনকি ঝড়, ঝঞ্ঝা, যুদ্ধ, ভূমিকম্প যাই হোক না কেন প্রায় ৪৫ তলা উঁচু বাড়ির সমান মন্দিরে উঠে এই কাজ প্রতিদিন করতেই হয় তাও কোনরকম সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই। কারণ মন্দিরের

নিয়মানুসারে যদি কোনো একদিন মন্দিরের পতাকা খোলা না হয় তাহলে মন্দির ১৮ বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। এই মন্দিরেই সিংহদুয়ারের কাছের ২২ টি সিঁড়ির মধ্যে তৃতীয় সিঁড়িটি তৈরি কালো পাথর দিয়ে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এই পাথর হল যমশীলা। কলিযুগের শুরুতে যমরাজ দেখলেন যে জগন্নাথ ধামে ঘুরতে এলেই মানুষ হয়ে যায় পাপমুক্ত। তাদের কর্ম যেমনই হোক না কেন। কারণ জগন্নাথ দেব মানুষকে এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে বাঁচানোর জন্যই পুরীকে বেছে নিয়েছিলেন। তাই নিজের সারাজীবনের পাপের অবসান ঘটাতে মানুষ দর্শন করতে থাকে জগন্নাথ দেবের। এরফলে যমালয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কমতে থাকে। তাই যমরাজ প্রভু জগন্নাথের শরণার্থী হন আর এই সমস্যার কথা জানান। কিন্তু এই ঘটনা শুনে জগন্নাথ দেব যমরাজকে বলেন মন্দিরের বাইশ সিড়ির তৃতীয় সিঁড়িতে শুয়ে পড়তে। আর সেই সাথে প্রভু জগন্নাথ যমরাজকে বরপ্রদান করেন যে যখনই কেউ এই তৃতীয় সিঁড়িতে পা ফেলে মন্দিরে প্রবেশ করবে তখনই তার সমস্ত পাপ দুর হয়ে যাবে কিন্তু সেইসাথে যখনই কেউ মন্দির থেকে ফেরার পথে এই তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখবেন তখনই যমরাজ চাইলে তার থেকে এই মন্দির দর্শনের পুণ্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। চারধামের এক ধাম এই পুরীর মন্দির এমনই আরও অনেক রহস্যে ঘেরা। যেমন এই মন্দিরের ভোগে ব্যবহার করা হয় সমস্ত দেশীয় ফসল ও মসলা তাই এই ভোগে জায়গা পায় না আলু টমেটোর মত বিদেশি খাবার ও এই ভোগে জায়গা পায় না লবঙ্গের মতো কোনো বিদেশী মসলাও, মন্দিরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই পাওয়া যায় না সমুদ্রের কোনো শব্দ, এই মন্দিরের উপর দিয়ে কখনোই কোনো পাখি বা উড়োজাহাজ উড়তে দেখা যায় না, মন্দিরের ওপরে লাগানো সুদর্শন চক্র পুরীর যেকোনো স্থান থেকেই দেখা যায় ইত্যাদি আরও কত কি। মনে হয় যেন এই মন্দিরকে জানার কোনো শেষ নেই এমনই তার মাহাত্ম্য।

শিল্পী - দেবার্পণ লাহা

চৌধুরী পরিবারের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো সফলভাবে

একটি প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন

পায়ে পায়ে পঁচিশ বছরের পথ হাঁটল চৌধুরী পরিবারের শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা। চৌধুরী পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান - বিজয়া সম্মেলন। ২৭শে অক্টোবর, ২০২৩ চৌধুরী পরিবারের শ্রীশ্রীদুর্গা মণ্ডপে ৬ টা ৪০ মিনিটে শুরু করা হয় অনুষ্ঠান। শ্রীশ্রীসারদা দেবীকে দীপ চৌধুরীর ঢাক বাদ্য ও সমবেত কণ্ঠে নারায়ণীস্তুতি নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব নেন শ্রী দীপ চৌধুরী। ডঃ শ্রী অসিত কুমার পাত্র আবৃত্তি করেন তাঁর রচনা 'কথামালা'। তাঁর পরে কুমারী সম্বীথি তরফদার পরিবেশন করেন সঙ্গীত। অনুষ্ঠানের মধ্যভাগে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান নিয়ে সংক্ষেপে বক্তৃতা দেন তন্ত্রধারক শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তী। রাত্রি ৯:০৫

পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠানে যাঁরা যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁরা হলেন - শ্রী মলিন চট্টোপাধ্যায় (স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি), শ্রী উপায়ন পাল (কবিতা 'পূজার সাজ'), কুমারী সৃষ্টি বসু (কবিতা 'মুক্তি'), কুমারী কঙ্কনা মুখার্জী ('বালা নাচো তো দেখি' ও 'আইলো উমা' - তে নৃত্য ও সঙ্গীত), কুমারী ভ্রমরী সরকার (নৃত্য - 'অয়ি গিরি নন্দিনি') এবং যুগ্মভাবে কুমারী মনোমিতা দাস ('টাপা টিনি' - তে নৃত্য)। গানের ডালি সাজিয়ে নিয়ে বসেন কোন্নগরে স্বনামধন্য শিল্পী শ্রী কাঞ্চন মুখার্জী এবং তাঁর ছাত্রী সর্ব শ্রীমতি শিয়া বাগচি এবং স্বপ্না ব্রহ্মচারী। শ্রী কাঞ্চন বাবুকে তবলায় সঙ্গত করেন অপর স্বনামধন্য শিল্পী শ্রী অভিজিৎ বোস। সমগ্র অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় কুমারী সৃজা চৌধুরীর 'প্রেমের জোয়ারে' সঙ্গীতে নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। শ্রী অনিরুদ্ধ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটির ভিডিও তোলা সম্ভব হয়। শ্রী কাঞ্চন গাঙ্গুলীর শব্দের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলন। সমগ্র অনুষ্ঠানের ভিডিও চৌধুরী পরিবারের ইউটিউব চ্যানেল C H O W D H U R Y S' - এ আপলোড করে দেওয়া হয়।

কবিতামালা

সৌরভ কর্মকার

আমিও শ্রমিক তুমিও শ্রমিক

দিনের শেষে রঙ মাখি
বড়বাবুদের হুকুম তাই
শূন্য পেটেই পুণ্য করি
অসুস্থ হলেও করেই যাই।

রঙ জোগাই লাল ঠোঁটেতে
হাতগুলো মোর ভীষণ কালো
আমরা শ্রমিক, বেজায় হাসি
'দেশের' নামে, তোরা ভোলাস ভালো।

খুব সুন্দর কথা ওদের
এক্কেবারে প্রাণময়
আমিও শ্রমিক, তুমিও শ্রমিক

উদযাপনের ইচ্ছে হয়?

ওরা বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবীর মাথা বড়
পেটের বোতাম আঁটা।
বুকে তাদের বিদ্যাসাগর
মুখে ফ্রী এর ভাতা।

চিত্রগ্রহণে - সৃজা চৌধুরী

দেখতে ভালোই নাদুসনুদুস
মুখের ভাষা ভালো
বাহিরে গিয়ে হাতাহাতি
সুবিধা নিয়ে চলো।

বুদ্ধিজীবী দেখে বাঁকা
স্বার্থ নিয়ে চলে।
শিরদাঁড়াটা বিকিয়ে দিয়ে
'জয় জয়' বলে।

ভেবে দেখো বুদ্ধিজীবী,
আমি তুমি সবাই এক
কারোর আছে টাকার থলি
কারোর আছে অফিস ব্যাগ,
কেউ বা করে তোষামোদি
কেউ বা হয় পকেটমার
কিন্তু তোমার মত কেউ গো নয়
বন্দী বুদ্ধির কাস্টোমার ।

নতুন করে প্রদীপ জ্বালো

আবার কবে হবে সকাল
ঘুচবে এই অন্ধ আলো
বলব আমরা সবাই মিলে
নতুন করে প্রদীপ জ্বালো।

যাব সবাই দূরে দূরে
থাকবে না কলঙ্কের কালো
যা গেছে তা যাক না বলে
নতুন করে প্রদীপ জ্বালো,
বলব সবাই,
নতুন করে প্রদীপ জ্বালো।

চিত্রগ্রহণে - সম্পূর্ণা কুন্ডু

Empowering Lives,
Creating Impacts

We at Astha have come together to make a small effort in the aim of wiping the poverty and provide the basic needs to the unprivileged people in our society.

OUR MOTTO

Providing Education

Society Development

People Wellbeing

We the group of people started our work by some charity and donations in 2019

28 + Events

20+ Volunteers

Running an Education Centre at Gosaba (Sundarban)

ContactUs
62918 11695

পরিশিষ্ট

লেখক লেখিকা শিল্পী পরিচিতি

১:অঙ্কুশ দাস

কোন্নগরের বাসিন্দা। পেশায় শারীরবিদ্যার ছাত্র, নেশায় লেখক ও আলোকচিত্রগ্রাহক। অন্যান্য লেখালেখি ও ছবি পাওয়া যাবে ঃ

- *"Unity"* https://youtu.be/pTPRZ-NIqyc?si=nBxBAWczLc5zc8VX
- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02UPcGy2QzSpVg3T-4DZgCPpBscUZrcx6w5sdmswuw6NwvNsq1xvNrVx2qy2onKgtER-l&id=100008234565277&mibextid=Nif5oz

২:অভিষেক কুন্ডু

ডন বসকো স্কুল, লিলুয়ার দশম শ্রেণির ছাত্র। অভিষেক ১৫ বছর বয়সী, NCC তে ex-LCPL, 1st Dan ব্ল্যাক বেল্ট হিসেবে অধিকার করেছে, এবং 7th International Championship এ silver পেয়েছে। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ার অভ্যাস। অভিষেকের সৃষ্টি *আনন্দমেলা, Canvas'23* পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। Instagram-id: @avishek123go

৩:অর্পিতা দে

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী। ভীষন পছন্দের শখ গান শোনা। মাঝে মধ্যে ছবি আঁকতে বেশ ভালো লাগে। কোন্নগরে বাড়ি।

৪.ঊপায়ন পাল

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। মাতা - নন্দিনী পাল এবং পিতা - জিতেন্দ্রনাথ পাল। কোন্নগরের বাসিন্দা। পড়তে এবং ছবি আঁকতে ভালোবাসা আছে।

৫.কুনাল চক্রবর্ত্তী

২০০০ সালে জন্ম, বাড়ি কোন্নগর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক এবং রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে জৈব রসায়নে বিশেষ পত্রে স্নাতকোত্তর। পেশায় শিক্ষক। গল্পের বই পড়া, পশু পরিচর্যা, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় আগ্রহী।

৬.দেবমাল্য লাহা

বাড়ি বর্ধমানের বাদশাহী রোডে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। চিত্রাঙ্কনে আগ্রহ। ভালো ক্যামেরা ম্যান!

৭.দেবার্পণ লাহা

বর্ধমান নিবাসী। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, চিত্রাঙ্কনে আগ্রহ। ছবি তুলতে খুব ভালোবাসে।

৮.নিবেদিতা শীল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ছবি আঁকা, ক্লাসিকাল ডান্স, আবৃত্তি করা নেশা। পশ্চিম আঁপ্তেড়, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা।

৯.পঞ্চানন সিংহ

বর্ধমান জেলার দেবীপুরের নিবাসী ছিলেন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ) - এর অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিসার ছিলেন। ভারত বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনবার ব্রিটিশের কারাগারে বন্দি ছিলেন। লেখালেখি, পত্রিকা সম্পাদনা, নিয়মিত বিদ্যাচর্চা, শরীরচর্চা, ব্যায়াম, জিমন্যাস্টিক, সাহিত্যপাঠ সহ অনেক বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল। ২০১২ সালের ২৯ শে নভেম্বর ৯৪ বছর বয়সে মারা যান। পুত্র শ্রী সুব্রত সিংহের সহযোগিতায় লেখাটি পাওয়া গেছে।

১০.পারিজাত চট্টোপাধ্যায়

বাড়ি যাদবপুরে। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। ছড়া ও গল্প লেখা নেশা। বাড়িতে প্রতিমাসে একটি করে দেওয়াল পত্রিকা (মাসিক) প্রকাশ করে চলেছে গত একবছর ধরে। পত্রিকাটির নাম *হংসবলাকা*। অন্যান্য রচনা *বনপলাশী, দুমদাম* ইত্যাদি পত্রিকায় লেখা প্রকাশ পেয়েছে।

১১.প্রসিতা মজুমদার

বাড়ি কোলাঘাটে। রসায়ন নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেছি। ভালো লাগে গান গাইতে, ছবি আঁকতে। ইউটিউবের channel এর লিঙ্ক https://youtube.com/@prasitamazumder6599?si=ykWKiBkk0vGrYl4z

১২.মধুপর্ণী চ্যাটার্জ্জী

বর্তমানে কোন্নগরের বাসিন্দা, পেশায় আইনজীবী। শখে আঁকিবুঁকি করা হয়, তবে পেশাগত কারণে সবসময় চর্চা করা হয়ে ওঠে না।

১৩.মলিন তমাল চট্টোপাধ্যায়

প্রথম জীবনে সাংবাদিকতা এবং কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে লেখার শুরু। ছন্দবদ্ধ কাব্য সৃষ্টিতে উৎসাহী। শৈশব ও কৈশোর ওড়িশার সিমেন্ট নগরী রাজগাঙ্গপুরে কেটেছে এবং পরবতী কালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গে, দীর্ঘকাল হাওড়াতে এবং বর্তমানে কোন্নগরে বসবাস।

"*ছন্দে কথায় স্মরণীয় তাঁরা*" পঞ্চাশটি কবিতার সংকলন, ২০১৭ , কোলকাতা পুস্তক মেলায় প্রকাশিত। (প্রয়াগ প্রকাশনী)

১৪.মিয়াঙ্ক চক্রবর্তী

বাড়ি কোন্নগরে। হিন্দমোটর এডুকেশন সোসাইটির সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। আঁকতে ভালোবাসে, তাছাড়া ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট। খেলা ধুলা খুব প্রিয়।

১৫.মোহর ব্যানার্জি

বাড়ি নবগ্রামে। সম্প্রতি রসায়নে মাস্টার্স কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভালো লাগে গান গাইতে, ছবি আঁকতে। ইউটিউবে একটি চ্যানেল আছেঃ https://youtube.com/@arindambanerjee47?si=GQ9YS9telgRARHYN

১৬.রিতীকা দত্ত

মধ্যমগ্রামের নিবেদিতা সরণীতে বাড়ি। সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্সে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। নাচ, আঁকা ইত্যাদি ভালোবাসে।

১৭.রিয়াঙ্কা সিনহা

সোদপুরে বাড়ি, কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। ছবি আঁকতে ছোটবেলা থেকে ভালোবসেন। চাকুরীজীবি, ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন।

১৮.শুভদীপ চক্রবর্তী

শিবপুর IIEST এর পদার্থবিদ্যার স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। দুর্গাপূজায় পাঁচ বছরের তন্ত্রধারক। গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। কোন্নগরে বাড়ি।

১৯.শুভ্রজিৎ বসু

পেশায় তরুণ চিকিৎসক, কোন্নগরের বাসিন্দা। অবসরে বই পড়তে, লেখালেখি করা নেশা। ছোটবেলায় তবলা চর্চা করেছেন। আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ আছে।

২০.শৌভিক চট্টোপাধ্যায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কবিতা বলা এবং ছড়া ও কবিতা লেখা নেশা। বেশ কিছু কবিতা *‘উদ্বোধন’* পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও টুকটাক কিছু ছড়া ও কবিতা প্রকাশ পেয়েছে *বনপলাশী*, *ব্যারাকপুর স্টেশন পত্রিকা* ইত্যাদিতে।

২১.শ্রদ্ধা মুখার্জী

উত্তরপাড়ায় বাড়ি। চাকুরীজীবি, HMEC তে স্কুলস্তরের শিক্ষা এবং বাগবাজার ওমেনস্ কলেজে মনোবিজ্ঞানে পত্রে শিক্ষা। শখ নৃত্য, ছবি তোলা এবং চিত্রাঙ্কণ।

২২.শ্রীতমা ভট্টাচার্য

ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। ছবি আঁকা, আবৃত্তি করা, গান গাওয়া খুব পছন্দ করে এবং নিয়মিত চর্চা করে। বাড়ি ব্যারাকপুরে।

২৩.সংবর্ত তরফদার

নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের শিক্ষক। কবিতা, চিত্র অঙ্কন, রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষ আগ্রহী এবং নিয়মিত চর্চা করেন। *অনন্য নান্দনিক, মুক্তমন, গণনাট্য, জোনাকি, লুব্ধক, উন্মেষ* পত্রিকায় বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

২৪.সম্পূর্ণা কুণ্ডু

ISI তে Statistics-এ PhD Scholar. কলকাতা নিবাসী। 1st Dan Karate Black belt. গল্পের বই পড়া, লেখালেখি করা, গান শোনা অবসর যাপনের অঙ্গ। ভ্রমণপিয়াসী। আলোকচিত্র গ্রহণ অন্যতম প্রিয় শখ। Instagram ID: i_am_thesampurnakundu

Magnificant, *আনন্দবাজার পত্রিকা* ইত্যাদিতে সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে।

২৫.সাগরিকা সিংহ

বাড়ি বর্ধমান জেলার দেবীপুর-এ। ইংরেজি স্নাতকের ছাত্রী । আঁকার প্রতি ভালোলাগা আছে।

২৬.সুদীপ্ত সরকার

পেশাগতভাবে চাকুরীজীবি। প্রথাগত শিল্প শিক্ষা নেই, শুধু প্রকৃতি, শিল্প এবং কৃষ্টি বিষয়ে আগ্রহ থেকে ছবি আঁকা। দুর্গাপুরের বাসিন্দা।

২৭.সুমন ভট্টাচার্য্য

নবগ্রাম সি-ব্লকের বাসিন্দা। আঁকতে ভালোবাসা আছে, তাছাড়া ঠাকুর দেখতে যাওয়া নেশা। প্রাণীবিদ্যার স্নাতকোত্তর করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

২৮.স্বস্তি বসু

বাচিক শিল্পী। কোন্নগর অলিম্পিক মাঠের সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। সখ - আবৃত্তি করা। নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল আছে। নাম - Bong's Voice-
https://youtube.com/@bongsvoice?si=0xQtddgDfQ3x1_VR

২৯.সৌরভ কর্মকার

বাড়ি কোন্নগরে। লেখালিখির প্রতি গভীর অনুরাগী এবং কলমের মাধ্যমে নিজের ভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। লেখায় প্রায়শই বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু, মানবিক সম্পর্ক এবং জীবনের নানাবিধ দিকের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সৌরভ নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করেন যে লেখালিখির মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে একটু ভালো জায়গায় রূপান্তর করতে পারি।

পরিবারের বর্তমান সদস্যদের পরিচিতি

প্রদীপ কুমার চৌধুরী

শিবশঙ্কর চৌধুরী ও সুপ্রভা চৌধুরীর প্রথম সন্তান। ছেলেবেলা থেকে শিল্পের প্রতি আকর্ষণ ছিল। ছোটবেলায় ঠাকুরের প্রতিমা বানানো দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতেন। খুব ছোটবেলায় তবলা বাজানো শিখেছিলেন; কিন্তু চর্চার অভাব হয়। একটু বড় বয়সে চাকুরিও করেন কিছুদিন এক বেসরকারী সংস্থায়। পরে শ্রী সুজিত দাম ও শ্রী শ্যামল গাঙ্গুলির কাছে ডিজাইনিং এর কাজের তালিম নিয়ে নিজের ব্যবসা করেন। বিদেশে বিভিন্ন স্কার্ফ, গারমেন্টের ডিসাইন নিজের তুলির দক্ষহস্তে এঁকেছেন; পেয়েছেন সেরা ডিসাইনের জন্য পুরস্কারও।

তাপসী চৌধুরী

বর্ধমান জেলার দেবীপুর গ্রামের পঞ্চানন সিংহ ও ছায়া রানি সিংহের তৃতীয় কন্যা। তরুণী অবস্থায় ব্রতচারীর লীডার ছিলেন। লিখেছেন কবিতাও কোন কোন সময়। রান্নার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আবৃত্তি করতে অত্যন্ত পটু।

কাজলি চৌধুরী

কোন্নগরের সুনীল কুমার বসু এবং গীতা রানি বসুর দ্বিতীয় কন্যা। বাল্যকাল থেকে সঙ্গীতে অত্যন্ত পারদর্শিনী। এছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতে রয়েছে বিশেষ দক্ষতা। ভালোবাসেন আবৃত্তি শুনতে।

সায়ক চৌধুরী

সমর চৌধুরী এবং কাজলি চৌধুরীর পুত্র। বাল্যকাল থেকে ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার ইত্যাদিতে অত্যন্ত পারদর্শী। আঁকাতেও যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। খেলেছেন ক্রিকেট কলকাতার ক্লাবের হয়েও। ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন পেশাগত ভাবে। সফটওয়ার কোম্পানিতে চাকুরি করেন।

দীপ চৌধুরী

প্রদীপ কুমার চৌধুরী ও তাপসী চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। রসায়নে স্নাতোকোত্তর শিক্ষার্জন করেছেন। বাল্যকালে তবলা, আঁকা শিখেছেন। ধ্রুপদী সঙ্গীতে বিশেষ আগ্রহী। দীপ চতুর্থ বারের জন্য দুর্গাপূজার পূজক হয়েছেন।

সৃজা চৌধুরী

সমর চৌধুরী এবং কাজলি চৌধুরীর কন্যা। বাল্যকাল থেকেই নৃত্যশিল্পে অত্যন্ত পারদর্শী। আঁকাতেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা আছে। সাংবাদিকতা ও গণ মাধ্যমের ছাত্রী। অসাধারণ ছবি তোলার দক্ষতা আছে।
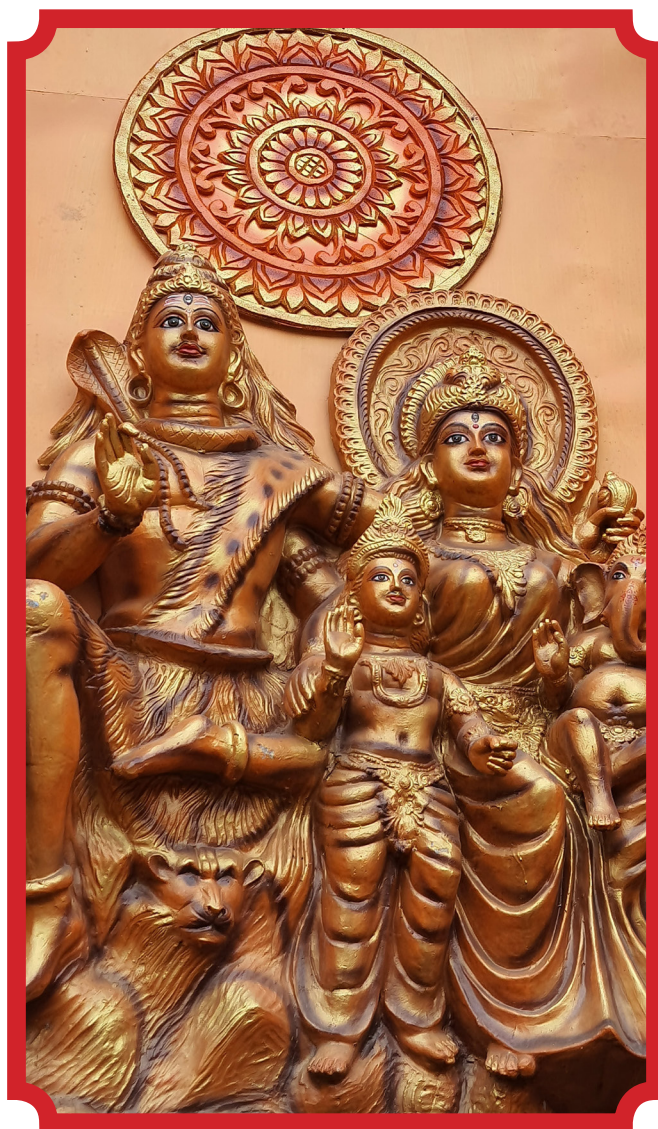
চিত্রগ্রহণে - সৃজা চৌধুরী

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎপার্থিবগং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাগং অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি বায়ুসমূহ মধুর হয়; নদীসমূহ মধুময় রস ক্ষরণ করে; ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হোক। রাত্রি এবং দিবসসকল মধুময় হোক; পৃথিবী-লোক মধুময় হোক; পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হোন। অরণ্যাধিপতি দেব আমাদেরকে মিষ্ট ফল দান করুন; সূর্য আনন্দপ্রদায়ক হোন; গরুগণ আমাদের নিকট সুখপ্রদ হোন।

ওঁ ত্রিবিধ বিঘ্ন (আধ্যাত্মিক বিঘ্ন, আধিদৈবিক বিঘ্ন ও আধিভৌতিক বিঘ্ন) -এর শান্তি হোক।
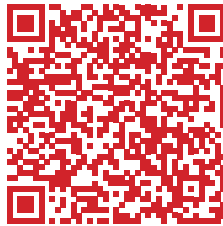
পায়ে পায়ে পঁচিশ পত্রিকাটি অনলাইনে পাঠ করার জন্য অথবা ডাউনলোড করার জন্য ওপরের কিউ আর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা এখানে ক্লিক করুন।

আলোকচিত্র গ্রহণ - প্রদীপ কুমার চৌধুরী, সমর চৌধুরী, তাপসী চৌধুরী, সায়ক চৌধুরী, দীপ চৌধুরী, সৃজা চৌধুরী, শুভদীপ চক্রবর্তী, রিয়াঙ্কা সিনহা, অঙ্কুশ দাস, রূপঙ্কর সেনগুপ্ত, সৃষ্টি বসু, অপর্ণা লাহা প্রমুখ।

প্রতিবেদন রচনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ - দীপ চৌধুরী

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা - তাপসী চৌধুরী, শৌভিক চট্টোপাধ্যায়

গ্রাফিক্স, এডিটিং, টাইপিং - দীপ চৌধুরী

চৌধুরী পরিবার
কোন্নগর, হুগলী, পঃ বঃ

https://sites.google.com/view/chowdhury

পত্রিকাটি বিনামূল্যে
বিতরণের জন্য। কোন বিনিময় মূল্য নাই।
****